

এবং প্রান্তিক

An International Research Refereed Journal

DIIF Approved Impact Factor : 1.83

Issue 3rd Vol. 9th May, 2016

সম্পাদক

আশিস রায়

E:\ebong prantik logo.tif

EBONG PRANTIK

Ebong Prantik

An International Research Refereed Journal

Editorial Board

**Executive Editor**- Prof.Bratati Chakravarty.

**Editor-** Ashis Roy.

**Co-Editor**-Tumpa Bapari, Asish Kr.Sau, Sujay Sarkar.

**Advisory Board** – Bibhabasu Dutta, Biswajit Karmakar, Soma Mukherjee, Akash Biswas, Tapas kumar Sardar, Mrinmoy Paramanik, Md.Intaj Ali, Mohankumar Mayra.

**Expert Members**-

Dr.Alok Ranjan Dasgupta (Hedelberg University)

Dr.Ujjal Kumar Mazumdar (Calcutta University)

Dr.Achinta Chatterjee (California University)

Dr.Alokesh Dutta Roy (Scientist/Pharmaceuticals, Boston)

Dr.Manas Majumdar (Calcutta University)

Dr.Subal Kumar Maity (Ex-Scientist, Min. of Ayush)

Dr.Tarun Mukhopadhyay (Calcutta University)

Dr. Sanat Kumar Naskar (Calcutta University)

Dr.Soumitra Basu (Rabindra Bharati University)

Dr.Srutinath Chakraborty (Vidyasagar University)

Dr. Shrabani Pal (Rabindrabharati University)

Dr.Sandip Kumar Mandal (Presidency University)

Dr. Uttam Kumar Biswas (Presidency University)

Dr.Sambhunath Bandyopadhyay (Burdwan University)

Dr.Mohinimohan Sardar (West Bengal State University)

Dr.Tania Hossain (Waseda University)

Dr.Soumitra Shekhar (Dhaka University)

Dr.Aloka Chatterjee (Banaras Hindu University)

Dr.Namita Bhattacharya (Banaras Hindu University)

Dr.Prakash Kumar Maiti (Banaras Hindu University)

Dr.Sumita Chatterjee (Banaras Hindu University)

Dr.Samaresh Debnath (Dhaka University)

Dr.Bhuina Iqbal (Chattagram University)

প্রচ্ছদ শিল্পী- তাপস রায়

ISSN : 2348-487X

প্রকাশ : ১৫ ই মে, ২০১৬

মূল্য : ১৫০ টাকা

\* লেখার দায়িত্ব লেখকের নিজস্ব। সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই পত্রিকার কোন অংশের কোনরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।

সূচীপত্র

|  |  |
| --- | --- |
| **চণ্ডীমঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে কথিত রবীন্দ্র-মন্তব্য : একালে তার প্রাসঙ্গিকতা বিচা**র  **ড. মোহিনীমোহন সরদার** | ১ |
| **আবুল হাসান: শান্তি আর শিল্পের কবি**  **মামুন রশীদ** | ১৫ |
| **শামসুর রাহমানের কবিতায় ঐতিহ্য**  **কাজী মহম্মদ আশরাফ** | ২৪ |
| **হাস্যরস সৃষ্টিতে কবি কৃত্তিবাস ও তাঁর রামায়ণ জয়ন্ত মণ্ডল** | ৫৮ |
| **হাবিব তনবীর: ভারতীয় নাট্য সাহিত্যের অন্যতম অধ্যায়**  **চন্দন বারিক** | ৭০ |
| **বর্তমানে কেরীচারণা**  **শারদীয়া ভট্টাচার্য** | ৭৭ |
| বেঁচে থাকার কঠিন লড়াই: সাম্প্রতিক কালের বাংলা আখ্যান  অনুপম সরকার | ৮৫ |
| ঘটি-বাঙাল সমস্যা ও সমরেশ মজুমদারের কয়েকটি উপন্যাস  সঞ্জীবন মণ্ডল | ৯৫ |

সম্পাদকীয়

ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। শুরু তো হয়েই ছিল। এ বুঝি ফিরে দেখার পালা। সব কিছু নিয়ে নতুন করে সাজিয়ে তোলা। ‘আতা গাছে তোতা পাখি’র সময় আর নেই। পরিণত বৃক্ষ রোপণের অঙ্গীকার। গ্লোবাল সিভিলাইজেশনে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস। শহরের রাজপথকে গ্রামের মেঠো পথে মিলিয়ে দেওয়ার সুযোগ। সাহিত্যের ধর্মও তাই। সাহিত্য এক মানুষের সঙ্গে অনেক মানুষের মেল বন্ধন ঘটায় সহজেই, আপন গুণে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলে সেখানে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে কথিত রবীন্দ্র-মন্তব্য : একালে তার প্রাসঙ্গিকতা বিচার

ড. মোহিনীমোহন সরদার

অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচয়িতা মুকুন্দ চক্রবর্তী এমন একজন কবি যিনি পুঁথি১ পত্রের যুগ থেকেই নিন্দিত এবং বন্দিত হয়েছেন বারবার। ১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দেপুঁথিপত্রের যুগেই রামানন্দ যতই মুকুন্দ কবিকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করে লিখেছিলেন –

‘চণ্ডী যদি দেন দেখা তবে কিতা জায় লেখা

পাঁচালির অমনি রচন ।

বুদ্ধি নাই যার ঘটে তারা বলে সত্য বটে

পথে চণ্ডী দিলা দর্শন ।।’২

আবার ঐ পুঁথিপত্রের যুগেই ভারতচন্দ্র মুকুন্দ কবিকে সম্মান জানিয়েছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্যকে স্বীকার ভাঁড়ুদত্তের বংশধর ঝড়ুদত্তকে নিজের কাব্যে স্থান দিয়ে কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন –

“আমল হাড়ার দত্ত ছিল ভাঁড়ুদত্ত।

তার বংশে ঝড়ুদত্ত ঠক মহামত্ত।।

ধুমী নামে তার নারী বড় কন্দলিয়া।

তার গর্ভে বসুন্ধরা জনমিল গিয়া।।”৩

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাতের দশক থেকে শুরু হয়েছে ছাপা অক্ষরে৪ মুকুন্দের প্রশংসা আর নিন্দার ধারা। ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড তাঁর ‘A grammar of the Bengal language’ গ্রন্থে ব্যাকরণের উদাহরণ দিতে গিয়েই প্রথম ছাপার অক্ষরে৫ যেমন মুকুন্দকে তুলে ধরলেন, তেমনই আবার তিনি ঐ গ্রন্থেই মুকুন্দের রচনা দক্ষতারও প্রশংসা করলেন। পরবর্তীকালে যতদিন গেছে ততই বেড়েছে মুকুন্দের প্রশংসা আর নিন্দার ধারা। ১৮৭১ এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে Calcutta Review পত্রিকায় ‘Bengali literature’৬ এবং বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ‘বাঙ্গালা ভাষা’**৭** নামের প্রবন্ধ দুটিতে মুকুন্দ চক্রবর্তীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অত:পর মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়৮, রামগতি ন্যায়রত্ন৯, রমেশচন্দ্র দত্ত১০, রাজনারায়ণ বসু১১, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী১২, গঙ্গাচরণ সরকার১৩, প্রমুখ বঙ্কিম গোষ্ঠীর লেখকগণ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রদর্শিত পথ১৪ অনুসরণ করে যখন মুকুন্দ চক্রবর্তী ও তাঁর রচিত কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তখন রবীন্দ্রনাথ সেই প্রশংসার বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে শুরু করলেন। তিনি তখন সদ্য ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরেছেন১৫। পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের আলোকে আলোকিত কবি১৬ ১২৮৭ সালে লিখলেন ‘বাঙ্গালী কবিনয়’১৭ প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ একদিকে কালীপ্রসন্ন ঘোষের ‘নীরব কবির তত্ত্ব’১৮ এবং অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বাঙ্গালী কবি কেন’১৯ প্রবন্ধ দুটির বক্তব্যকে অস্বীকার করে উক্ত দুই প্রাবন্ধিককে তীব্রভাষায় আক্রমন২০ করলেন। আর তাঁর বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে উদাহরণ হিসাবে তিনি তুললেন মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদাহরণকে২১। তাঁর বক্তব্যে ফুটে ওঠে মুকুন্দ কবির ‘কল্পনা’ ও ‘পরিমাণ সামঞ্জস্যের অভাব।’ আমরা আগেই স্বীকার করেছি দীর্ঘ এই প্রবন্ধটি মুকুন্দ বিরোধীতার জন্য নয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের আলোকে বাংলা কাব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়েই লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাতে মুকুন্দ ভক্তগণ কবিকে তীব্র আক্রমণ করতেই রবীন্দ্রনাথ সেই আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করলেন। তাঁর একাধিক প্রবন্ধে মুকুন্দ কাব্য প্রসঙ্গের উল্লেখ করে পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের বিচারে সমকালীন মুকুন্দ ভক্তদের২২ বিরোধীতা করলেন।

ঠিক এইরকমই একটি সময়ে ১২৮১ (১৮৭৪) বঙ্গাব্দে অগ্রাহায়ণ মাস থেকে সারদাচরণ মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও বরদাকান্ত মিত্রের সম্পাদনায় প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ এর বিভিন্ন ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে। এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে ‘বিদ্যাপতি’ দ্বিতীয় খণ্ডে ‘চণ্ডীদাস’, তৃতীয় খণ্ডে ‘গোবিন্দ দাস’, চতুর্থ খণ্ডে ‘রামেশ্বরের সত্য নারায়ণের পাঁচালী’ এবং পঞ্চম খণ্ডে ‘মুকুন্দরাম কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। ২৮ অগ্রাহায়ণ ১২৮১ ‘সাধারণী’ পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও তাঁর সহযোগীরা। সেখানে বলা হয়েছিল –

“প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ (মাসিক)। আমরা বিদ্যাপতি, গোবিন্দ, কবিকঙ্কন প্রভৃতি প্রাচীন কবিগনের কাব্য অগ্রাহায়ণ মাসই মাসিক সংখ্যায় প্রকাশ করিতেছি। পাঠ যতদূর পরিশুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহা হইবে, যত্নের ত্রুটি হইবে না এবং স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দ ও দুরূহ পদের অর্থ দেওয়া যাইবে প্রত্যেক কবির এক একটা সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত, কাব্যের গুন বিচার ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইবে। চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণ যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। ... প্রতিখন্ডের মূল্য চারি আনা মাত্র।”

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও তাঁর সহযোগীদের সম্পাদিত এই গ্রন্থগুলির গ্রাহক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘জীবনস্মৃতি’র ‘ঘরের পড়া’ অংশটি থেকে আমরা জানতে পারি এই খণ্ডগুলি রবীন্দ্রনাথের ‘লোভের সামগ্রী’ ছিলো। তিনি গভীর আগ্রহে উৎসাহে গ্রন্থগুলি পাঠ করতেন। সম্পাদকত্রয় গ্রন্থগুলির ‘পরিশুদ্ধ পাঠ’ যত্নসহ নির্ণয়ের চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রচলিত শব্দ ও দুরূহ পদের টিকা টিপ্পনী করে দেওয়া হবে বলে পাঠকের কাছে উপরিউক্ত বিজ্ঞাপনে যে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়েছিলেন তা তাঁরা রক্ষা করতে পারেননি বলে রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করলেন। যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই অভিযোগ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনাও করলেন। তাঁর বক্তব্য – “সম্পাদক শ্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার যথাসাধ্য যে কথার যে রূপ অর্থ করিয়াছেন, যে শ্লোকের যে রূপ ব্যাখা করিয়াছেন পাঠকেরা কি একবার মনোযোগ করিয়া দেখিবেন না, যে তাহা ব্যাকরণ শুদ্ধ হইল কিনা, সুকল্পনা সংগত হইল কি না? সে বিষয়ে কি একেবারে মতভেদ হইতেই পারে না? ... বঙ্গভাষা যাঁহাদের নিকট নিজের অস্তিত্বের জন্য ঋণী, এমন সকল পূজনীয় প্রাচীন কবিদিগের কবিতা সকলের প্রতি যে সে যে রূপ ব্যবহার করুক না আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া চাহিয়া থাকিব?... যিনি এই সকল কবিতার সম্পাদকতা করিতে চান তিনি নিজের স্কন্ধে একটি গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রতিপদে সাধারণের নিকটে হিসাব দিবার জন্য তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন। ... কবি দিগের কাব্য যিনি সংগ্রহ করেন, তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে যদি অসাবধানতা, অবহেলা, অমনোযোগ লক্ষিত হয়, তবে তাঁহার বিরুদ্ধে আমরা গুরুতর তিনটি নালিশ আনিতে পারি – প্রথমত, কবিদের প্রতি তিনি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যের সহিত তিনি যে চুক্তি করিয়াছিলেন, সে চুক্তি রীতিমত পালন করেন নাই; তৃতীয়ত, পাঠক সাধারণকে তিনি অপমান করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, অথচ যথাযোগ্য আয়োজন করেন নাই। ... অক্ষরের ভুল হইল, তাহাতে কী আসে যায়? অর্থবোধ হইতেছে না। একটা আন্দাজ করিয়া দেও না, কে অনুসন্ধান করিয়া দেখে? পাঠকের প্রতি এরূপ ব্যবহার কি সাহিত্য আচারের বিরুদ্ধ নহে?২৩”

এরপরের ইতিহাস সাহিত্য রসিকের অজানা থাকার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাপতির পদ তুলে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ব্যাখ্যার পাশাপাশি নিজের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে সম্পাদকের সম্পাদনা কর্মের ফাঁকগুলি দেখিয়েছেন। বিদ্যাপতির পদের শব্দার্থ ধরে ধরে রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা শুধু সেকালেই নয় একালেও তা নতুন পথের সন্ধান দেয়। মূলতঃ এই কারনেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। উক্ত পদাবলী সম্পাদনার সঙ্গে থাকলেও সময়াভাবে এবং তার টীকা টিপ্পনী লেখা ‘খাতার অভাবে’২৪ রবীন্দ্রনাথ তা করে উঠতে পারেননি বলেই জানা যায়।

বঙ্কিম গোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে কিশোর রবীন্দ্রনাথের যখন এই রূপ বাদানুবাদ মসীযুদ্ধের পরিণতি পাচ্ছে ঠিক তখনই অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের পঞ্চম খণ্ড কবিকঙ্কনে চণ্ডীমঙ্গলে গ্রন্থটি তার হাতে আসে। এই গ্রন্থটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির মার্জিনে বহু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন। রবীন্দ্রমন্তব্যে সমৃদ্ধ সেই গ্রন্থটি একদা বিশ্বভারতীর কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল। গ্রন্থটির কল নম্বর ছিলো –‘৮১.৩৭৭ মু’। উক্ত কার্ড ইন্ডেক্স থেকে গ্রন্থটির যে বিবরণ পাওয়া যায় তা এই রূপ –

“মুকুন্দরাম চক্রবর্তী/ কবিকঙ্কন-চণ্ডী/ অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত/ চুঁচুড়া/ ১২৮৫/ ৮০০ পৃষ্ঠা।”

গ্রন্থটি পাঠ করার অব্যবহিত পরে প্রথমবর্ষ ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উপর একটি আলোচনা লিখেছিলেন, যে লেখাটির কথা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে স্বীকার করেছিলেন। এই লেখাটি উদ্ধার হলে কবি-কঙ্কন চণ্ডী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব প্রথম দিকে কেমন ছিল, তা স্পষ্ট হতো বলেই আমাদের বিশ্বাস। সে যাই হোক প্রথম পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ ‘য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী’, দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি (সংখ্যা ২৪৬) শেষের ছয়টি পৃষ্ঠায় ‘সন্দেহ স্থল’ শিরোনামে উক্ত গ্রন্থের ২২৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শব্দার্থের আলোচনা ও তাঁর সঙ্গে কথা জানিয়েছেন। এ নিয়ে গবেষকগন বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই শব্দার্থ এবং তাঁর সন্দেহের আলোচনাগুলির কিছু অংশ এইরূপ –

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত ‘কবিকঙ্কন-চণ্ডী’ গ্রন্থের ‘গণেশ বন্দনা’ অংশে আছে – “অঙ্গের বন্ধুক ছটা আজানু লম্বিত জটা

শশিকলা মুকুট মণ্ডণ।”

উক্ত পাঠের ‘আজানু লম্বিত জটা’ নিম্নরেখাঙ্কিত করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থপৃষ্ঠার মার্জিনে লিখেছেন – ‘গণেশের জটা আছে কি?’

ঐ একই বর্ণনার শেষের দিকে আছে –

‘কুসুম-চর্চিত অঙ্গ শৃণ্ডে শোভে মাতুলুঙ্গ

শূনদণ্ড ইষু পাশ করে।’

‘মাতুলুঙ্গ’ শব্দটিকে নিম্নরেখাঙ্কিত করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন – ‘অর্থ কি?’ এবং তারপর নিজেই অর্থ করেছেন – ‘মাতুলুঙ্গ বৃক্ষ বিশেষ মুদ্রিত পুস্তক সকলে মাতু অঙ্গ আছে। আমাদিগের পুঁথিতে মাতুলঙ্গ আছে, কোনটিই সুংসগত বোধ হয় না।’

উক্ত গ্রন্থের ‘চণ্ডী বন্দনা’য় আছে –

“করি অরি জিনি মধ্যমাজাক্ষীণী কাটিতে কিঙ্কিণী বাজে।

জিনি করি কর জখন সুন্দর নিতম্বে বসনা সাজে।।

নাভি সরোবর তথির উপর তনুরুহ অঙ্কুর দাম।

উচ্চ কুচগিরি জিনি কুম্ভকরী করী করে জলপান।।”

উপরিউক্ত চরণগুলি দ্বিতীয় চরণটিকে নিম্নরেখাঙ্কিত করে রবীন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছেন – ‘কিরূপ উপমা?’ এবং চতুর্থ চরণটিকে নিম্নরেখাঙ্কিত করে তিনি লিখেছেন – ‘অর্থ কি?’

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত ‘কবিকঙ্কন-চণ্ডী’ গ্রন্থের ‘গ্রন্থোৎপত্তির কারণ’ অংশে আছে –

“সরকার হইল কলি খিলভূমি লেখে লাল

বিনা উপকারে খায় ধুতি।

পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম

পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।।

ডিহিদার অবোধ খোঁজ কড়ি দিলে নাহি রোজ

ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে। ...”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন – সমস্তটার অর্থ কি? ‘ধুতি অর্থে ঘুস স্থানে স্থানে অনুমান হয়।’

আবার ঐ একই বর্ণনার শেষের দিকে আছে –

“হাতে লইয়া পত্র মসী আপনি কলমে বসি

নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থ মার্জিনে লিখেছেন – ‘আপনি শব্দের Root কী?’

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত গ্রন্থের ‘ফুল্লরার বারমাস্যা’ অংশে আছে –

“তৈল তুলা অননুপাৎ তাম্বুল তপন।

করয়ে সকল লোক শীত নীবারণ।।”

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – ‘তাম্বুল কি করে শীত নিবারণ করে?’

মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পাঠ করে পাঠ প্রতিক্রিয়ায় বলা তাঁর এই রূপ জিজ্ঞাসা পরবর্তীকালেও বজায় ছিল। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পাওয়া বঙ্গবাণী সংস্করণে২৬ তার প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রনাথের এই জিজ্ঞাসু মনোভাব শুধু সেকালে নয়, একালেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এর কয়েক বছর পর অর্থাৎ ১২৯৩ বঙ্গাব্দের অগ্রাহায়ণ সংখ্যা ‘নবজীবন’ পত্রিকায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার ‘কাব্যি সমালোচনা’ নামক প্রবন্ধে মুকুন্দের প্রশংসা করে লিখলেন –

“কবিকঙ্কণের দারিদ্র দুঃখ বর্ণনা যে কখন দুঃখের মুখ দেখে না। তাহাকেও দীনহীনের কষ্টের কথা বুঝাইয়া দেয়।

দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।

আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।।

দু-বেলা দু-সন্ধ্যা অন্ন জুটে না- কোন দিন ভাত খাই, কোন দিন বা আমানি খাইয়া কাটাই। খাবার তো কোন পাত্র নাই যে ভাত পাতে খাওয়া যায়, আমানি তো পাতে খাওয়া যায় না, হাঁড়িতেও খাইতে নাই, মেঝেয় গর্ত করিয়া রাখিয়াছি, তাহাতে ঢালিয়া আমানি খাই।

“যে আমানি খাইয়া মধ্যে মধ্যে দিন কাটায়, সে অত কথা বলিবে কেন? সে বলিল, আমাদের দুঃখ বুঝিবেত ঐ আমানি খাবার গর্ত দেখ।”

“দারিদ্র্যের কি কঠোর অভিব্যক্তি। কথা কয়টা বুকের ভিতর বসিয়া যায়। ভাঙ্গা ঘরের গর্ত কয়টা বিলাসীগণের জটে ধরিয়া তাহাদিগকে নাড়া দিতে থাকে। আবার বলি ইহাই সার্থক কবিত্ব; সার্থক কল্পনা। সার্থক প্রতিভা।”২৭

একদিকে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, গঙ্গাচরণ সরকারদের ভূয়সী মুকুন্দ প্রশংসা ও মুকুন্দ পূজা অন্যদিকে নাড়া দিতে থাকে। এর মতো উদ্দেশ্য প্রণোদিত মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ ১২৯৩ বঙ্গাব্দে চৈত্র সংখ্যা ‘ভারতী ও বালক’ পত্রিকায় লিখলেন – ‘কাব্যঃ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট’ প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ জানালেন –

“আমানি খাবার গর্ত দেখাইয়া দারিদ্র্য সপ্রমাণ করার মধ্যে কতকটা নাট্য নৈপুণ্য থাকিতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যে কাব্য রস কোথায়? দুটো ছত্র, কবিত্বে সিক্ত হইয়া উঠে নাই, ইহার মধ্যে অনেকখানি আমানি আছে, কিন্তু কবির অশ্রুজল নাই। ইহাই যদি কবিত্ব হয় তবে। তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘটে; সে তো আরো কবিত্ব।”২৮

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দের কবিত্ব ও বাস্তবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত পরবর্তীকালেও বজায় ছিল। বারমাস্যায় কালকেতুর পারিবারিক দারিদ্র্য বর্ণনা আসলে যে ফুল্লরার বানানো অতিশয়োক্তি সেকালের মুকুন্দ ভক্তরা তা সেদিন বুঝতে পারেননি। অথচ ঐ বয়সেই রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে সেই সত্য সেদিন ধরা পড়েছিল।

এরপর যতদিন গেছে ততই মুকুন্দ চক্রবর্তী ও তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা আরো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। ‘বাঙ্গালী কবি নয়’ প্রবন্ধ (ভারতী, ভাদ্র-১২৮৫) থেকে শুরু করে সাহিত্যের মূল্য (১৩৪৮) পর্যন্ত দীর্ঘ তেষট্টি বছর ধরে তিনি মোট ৩৪টি স্থানে চণ্ডীমঙ্গল প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, একালেও আমরা তাঁর সেই বক্তব্যকে অস্বীকার করতে পারি না। মনে রাখা দরকার যে উনিশ শতকের ওই সময়টি ছিল মুকুন্দ পূজার কাল। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রমেশচন্দ্র দত্ত ও দুই অক্ষয়চন্দ্র সকলেই মুকুন্দের এতটাই অন্ধ ভক্ত যে, সমকালীন মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রমুখ আধুনিক কবিদের উপরেও তাঁরা মুকুন্দ চক্রবর্তীকে স্থান করে দিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। এই অন্ধ মুকুন্দ প্রশস্তির বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের কবিকঙ্কন-চণ্ডীর তীব্র সমালোচনা করলেন ‘বাঙ্গালী কবি নয়’ প্রবন্ধে বাঙালির কবিত্ব প্রতিভার দুর্বলতা দেখতে গিয়ে তিনি কবিকঙ্কন-চণ্ডীর ‘কমলেকামিনী’ প্রসঙ্গে মুকুন্দের ‘সৌন্দর্য কল্পনার অভাব ও অসামঞ্জস্য’ এর কথা বললেন এবং সমগ্র কাব্যটির দীর্ঘ সমালোচনা করে লিখলেন –

“কবিকঙ্কণের কাব্য অতি সরল কাব্য। কিন্তু উহা লইয়া আমরা বাঙ্গালী জাতিকে কবি জাতি বলিতে পারিনা।”

এই সমালোচনায় ভারতচন্দ্রের সঙ্গে মুকুন্দ প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন –

“কবিকঙ্কণের দেব-দেবীরাও নিতান্ত মানুষ। কেবলমাত্র মানুষ নহে। কবিকঙ্কণের সময়কার বাঙ্গালী। হর গৌরীর বিবাহ, মেনকার খেদ, নারী পতিনিন্দা, হর গৌরীর কলহ পড়িয়া দেখ দেখি। কবিকঙ্কণ মহাকাব্য নহে। আয়তন বৃহৎ হলেই২৯ কিন্তু তাহাকে মহাকাব্য বলা যায় না। ভারতচন্দ্রের কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। তাহার মালিনী মাসি, তাহার বিদ্যা, তাহার সুন্দর, তাহার রাজা ও কোটালকে মহাকাব্যে বা প্রথম শ্রেণীর কাব্যের পাত্র বলিয়া কাহারো ভ্রম হইবে না। বিদ্যা পড়িয়া কাহারো মনে কখনো মদানভাব বা যথার্থ সুন্দর ভাবে উদয় হয় নাই। কিন্তু এই গ্রন্থটি বাঙ্গালী পাঠকদের রুচির এমন উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে, যে বঙ্গীয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ইহা অতি উপাদেয় হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর যতলোক পড়িযাছে, লোকে কি শ্রেষ্টতর কাব্য কবিকঙ্কন-চণ্ডী পড়িয়াছে।”৩০

রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্র অপেক্ষা মুকুন্দ প্রতিভাকে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলেছেন। তাঁর সেই সিদ্ধান্ত একালেও সমান ভাবে স্বীকৃত তবে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর মধ্যে মহাকাব্যিক বৈশিষ্ট্য খুঁজতে গিয়ে তার যে বিরূপ সমালোচনায় তিনি করলেন, সেই সমালোচনার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়ে গেল মুকুন্দের বাঙালিয়ানা, কথা সাহিত্যিক সুলভ। তাঁর নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তি, তাঁর সরস কৌতুক প্রবণতা এককথায় মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হতে পাড়ার সপ্রশংস গুনগুলি। তরুণ রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করার উগ্র ঝাঁঝে বুঝতেই পারলেন না যে আসলে মুকুন্দের গুণগুলিই তিনি আবিষ্কার করে দিলেন। লিখলেন –

“কবিকঙ্কণ-চণ্ডী অতি সরল কাব্য সন্দেহ নাই। বাঙালীরাও এ কাব্য লইয়া গর্ব্ব করিতে পারে। কিন্তু ইহা এমন কাব্য নহে, যাহা লইয়া সমস্ত পৃথিবী গর্ব্ব করিতে পারে; অত আশায় কাজ কি, সমস্ত ভারতবর্ষ গর্ব্ব করিতে পারে। তখনকার বঙ্গবাসী গৃহ অতি সুচারুরূপে চিহ্নিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণের কল্পনা তখনকার হাটে, ঘাটে, মাঠে জমিদারের কাছারিতে চাষার ভাঙ্গা কুঁড়েতে। মধ্যবিত্ত লোকের অন্তঃপুরে যথেষ্ট বিচরণ করিয়াছে। কোথায় ব্যাধের মেয়ে –

“মাংস বেচি লয় কড়ি চাল লয় ডালি বড়ি

শাক বাইগুণ কিনয়ে বেসাতি।”

কোথায় চাষার “ভাঙ্গা কুড়িয়া, তালপাতার ছাউনি” আছে যেখানে অল্প “বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় ভাসিয়া যায় বাণ।” কোথায় গাঁয়ের মণ্ডল ভাঁড়ুদত্ত হাটে আসিয়াছে–

“পসারী পসার লুকায় ভাঁড়ুর তরাসে।

পসার লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ি,

যতদ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাহি দেয় কড়ি।”

তাহা সমস্ত তিনি ভাল করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু এই হাট মাঠেই কল্পনার বিচরণের পক্ষে যথেষ্ট? কল্পনার ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত ও ক্রীড়াস্থল আছে।”৩১

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বুঝি মুকুন্দ বিরোধী ছিলেন। সেকথা জোরের সঙ্গে কোনো কোনো সমালোচক বলেওছেন। কিন্তু তিনি যে কবিকঙ্কণ-চণ্ডী কাব্যের একজন নিরপেক্ষ সমালোচক ছিলেন তাও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কোনো কোনো সমালোচক। আর রবীন্দ্রনাথ যদি মুকুন্দ বিরোধী হবেন, তাহলে অর্ধশতধিক কাল ধরে সে কবিকে বার বার স্মরণ করে নিজের লেখায় টেনে আনবেন কেন? চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত চরিত্রগুলির যথাযথ সমালোচনা তাঁর কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ‘সাধনা’ পত্রিকায় ‘নরনারী’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন –

“কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর বৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থানুমাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোনো কাজের নহে।”৩২

কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যে সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা সমাজতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটটি রবীন্দ্রনাথের প্রধান বিচার্য হয়েছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ (২য় সংস্করণ) গ্রন্থটির সমালোচনা করতে গিয়ে। নবপর্যায় ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩০৯) প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধে তিনি দেখলেন এক ‘আধ্যাত্মিক অরাজকতা’র মধ্যে খামখেয়ালি ‘মেয়েদেবতা’ চণ্ডীর শক্তির লীলা। পরাজিত হয় ‘শিবশক্তি’। পরবর্তীকালে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩২৬) ‘বাতায়নিকের পত্র’ এবং ‘শক্তিপূজা’ (কার্ত্তিক ১৩২৬) আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনা করতে গিয়ে যুরোপে শক্তির মদমত্ততাকে তুলনা করলেন ‘চণ্ডীর’ খামখেয়ালী শক্তির লীলার সঙ্গে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করে নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি।

অপরপক্ষে বার বার মুকুন্দ প্রতিভার প্রশংসা করলেন রবীন্দ্রনাথ ভাঁড়ুদত্ত চরিত্র সৃষ্টির চূড়ান্ত শৈল্পিক দক্ষতার কারণে। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ‘সৌন্দর্য ও সাহিত্য’ (বৈশাখ ১৩১৪) প্রবন্ধে লিখলেন –

“কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্তের যে বর্ণনা আছে, সে বর্ণনায় মানুষের চরিত্রের যে একটা বড়দিক দেখানো হইয়াছে তাহা নহে; এই রকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়ালি করিতে মজবুত লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি। তাহাদের সঙ্গে যে সুখবর তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু কবিকঙ্কণ এই ছাঁদের মানুষটিকে আমাদের কাছে যে মূর্তিমান করিতে পারিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভাষায় এমন একটা কৌতুক রস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর সভায় নয়, আমাদের হৃদয়ের দরবারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত প্রত্যক্ষ সংসারের ঠিক এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না। আমাদের মনের কাছে সুসহ করিবার পক্ষে ভাঁড়ুদত্তের যতটুকু আবশ্যক, কবি তাহার চেয়ে বেশি কিছু দেন নাই কিন্তু প্রত্যক্ষ সংসারে ভাঁড়ুদত্ত ঠিক ওইটুকু মাত্র নয়। এই জন্যই সে আমাদের কাছে অমন করিয়া গোচর হইবার অবকাশ পায় না। কোনো একটা সমগ্রভাবে সে আমাদের কাছে গোচর হয়না বলিয়াই আমরা তাহাতে আনন্দ পাই। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জন করিয়া কেবল একটা সমগ্র রসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।”৩৩

আমরা যদি মুকুন্দের কাব্যের অন্যান্য সমালোচনার কথা বাদও দিই এই একটি মাত্র চরিত্রের সৃষ্টিতেই রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি পেয়েছেন কবি। প্রয়াণের কয়েকমাস পূর্বেও এই চরিত্রটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চূড়ান্ত মত জানিয়েছেন প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত ‘সাহিত্যের মূল্য’ (জৈষ্ঠ্য ১৩৪৮) প্রবন্ধে।

তাঁর বক্তব্য –

“কবিকঙ্কণের সমস্ত কাব্য রাশি কালে কালে অনাবৃত হতে পারে, কিন্তু রইল তাঁর ভাঁড়ুদত্ত।”

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য –

১। ‘পুথি’ শব্দটি সংস্কৃত ‘পুস্তক’ শব্দটি থেকে এসেছে। শব্দটির বিবর্তনে আনুনাসিকতা নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে তা মানতেন না। তিনি ‘পুথি’ শব্দটিতে আনুনাসিকতা দিতে চেয়েছেন। তাঁর মতটি এখানে গ্রহণ করে আমরা পুথি শব্দটিতে আনুনাসিকতা যোগ করেছি।

২। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: রামানন্দ যতি লিখিত চণ্ডীমঙ্গল – অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।

৩। দ্রষ্টব্য: ভারতচন্দ্র রচিত - অন্নদামঙ্গল, বসুন্ধরার জন্ম।

৪। ডঃ বিজিতকুমার দত্ত জানিয়েছেন – কাব্যটি ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে বটতলা প্রথম মুদ্রিত করে। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, বসুমতী সংস্করণ, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পরিচিত অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৩) কিন্তু সুকুমার সেন জানান – “কবিকঙ্কণের কাব্য বহুবার ছাপা হইয়াছে। প্রথম ছাপা হইয়াছিল ১২৩০ সালে অর্থাৎ ১৮২৩-২৪ খ্রিষ্টাব্দে;” (দ্র. সুকুমার সেন সম্পাদিত কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি ২০০১, ভূমিকা, পৃষ্ঠা- ১২-১৩।) যদিও এরও আগে ব্যাকরণের উদাহরণ হিসাবে ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দেই মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল প্রথম ছাপা খানায় আসে।

৫। দ্রষ্টব্য: Nathaniel Brassey Halhad : A Grammar of the Bengal Language, Unabridged facsimile edition, Ananda Publishers Private limited, Calcutta, 1980.

6. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: Calcutta Review, Vol-104, PP-294-316.

৭। দ্রষ্টব্য: বঙ্গদর্শন ১ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১২৭৯, পৃষ্ঠা ৩৪৬-৩৪৮।

৮। দ্রষ্টব্য: মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার ইতিহাস, ১ম ভাগ জ্যৈষ্ঠ সম্বৎ ১৯২৮, গুপ্তযন্ত্র, কলিকাতা।

৯। দ্রষ্টব্য: রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, প্রথম প্রকাশ ১৮৭২, বুধোদয় যন্ত্র, হুগলী।

১০। দ্রষ্টব্য: রমেশচন্দ্র দত্ত, The literature of Bengal, 1877, I.C.Bose & co, Stanhope Press, Calcutta.

১১। দ্রষ্টব্য: রাজনারায়ণ বসু, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা ১৮৭৮ সাল, বঙ্গভাষা আলোচনা সভা, কলিকাতা।

১২। দ্রষ্টব্য: অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, বঙ্গসাহিত্য, ভারতী, কার্তিক-১২৮৫।

১৩। দ্রষ্টব্য: গঙ্গাচরণ সরকার, বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে বক্তৃতা, ১৮৮০, নন্দলাল বসু, সাধারণী যন্ত্র, চুঁচুড়া।

১৪। বঙ্কিমচন্দ্র প্রদর্শিত পথ বলতে মুকুন্দ প্রশংসার ধারার কথা বোঝানো হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র মুকুন্দের প্রশংসা করার পর থেকে তাঁর অনুগামীরা সেই পথই অনুসরণ করেছিলেন বারবার। যা পরবর্তীকালে মুকুন্দ প্রশংসার ধারা তৈরী করেছিল।

১৫। ভারতী পত্রিকায় ভাদ্র ১২৮৭ বঙ্গাব্দে লেখা ‘বাঙালী কবি নয়’ প্রবন্ধটি লেখার মাত্র ছয়মাস আগে রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরেছেন।

১৬। প্রায় দে’ড় বৎসর ইংল্যান্ডে কাটিয়ে এবং হেনরি মরলির শিক্ষার প্রভাবে ইংরেজী সাহিত্য জগতে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ কবির ‘জীবনস্মৃতি’র ভগ্নহৃদয় অধ্যায়ে তিনি নিজেই বলেছিলেন- ‘তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্য দেবতা ছিলেন শেক্সপীয়র মিল্টন ও বায়রন ইহাদের লেখার ভিতরকার জিনিষটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়বেগের প্রবলতা’।

১৭। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: বাঙ্গালী কবি নয়, ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭, পৃষ্ঠা-২১৯-২২৯।

১৮। দ্রষ্টব্য: কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নীরব কবি, বান্ধব, মাঘ-১২৮১, পৃষ্ঠা- ১৮৫-১৮৯।

১৯। দ্রষ্টব্য: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালী কবি কেন, বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮২, পৃষ্ঠা- ৩৯০-৪০৪।

২০। বাঙ্গালী কবি নয় প্রবন্ধটিতে উক্ত দুই বক্তব্যকে আক্রমণ এবং নসাৎ করে রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করলেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: বাঙ্গালী কবি নয়, ভারতী, ভাদ্র, ১২৮৭, পৃষ্ঠা- ২১৯-২২৯।

২১। মুকুন্দ চক্রবর্তী ও তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে নয়, নিছক সমকালীন সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়েই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদাহরণ তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

২২। সমকালীন মুকুন্দ ভক্ত বলতে মূলত বঙ্কিম গোষ্ঠীর লেখকগণকেই বোঝানো হচ্ছে।

২৩। দ্রষ্টব্য: বাংলা শব্দতত্ত্ব, তৃতীয় স্বতন্ত্র সংস্করণ ১৩৯১, প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ, পৃষ্ঠা-৩২৭-৩২৮।

২৪। যে খাতাটি তিনি প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ অবলম্বনে বৈষ্ণব পদাবলীর শব্দার্থ, ব্যাকরণের বিশেষত্ব, টীকা-টিপ্পনী লিখেছিলেন। খাতাটি ১৩০৩ সাল নাগাদ কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদকে ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আর তা ফেরৎ পান নি।

২৫। গ্রন্থটির হদিস আর পাওয়া যায় না।

২৬। দ্রষ্টব্য: দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দের অভয়ামঙ্গল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য সম্বলিত, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৯০।

২৭। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কাব্যি সমালোচনা নবজীবন, ৩য় ভাগ, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১২৯৩, পৃষ্ঠা- ৩১৫

২৮। দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা-১৭২।

২৯। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাব্যের বৃহদায়তন দেখে কাব্যটিকে মহাকাব্য বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই তত্ত্বকে বাতিল করে দেন।

৩০। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাঙ্গালী কবি নয়, ভারতী ৪৯ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১২৮৭, পৃষ্ঠা- ২২৮।

৩১। দ্রষ্টব্য: পূর্বে উল্লেখিত সূত্র, পৃষ্ঠা – ২২৮-২২৯

৩২। দ্রষ্টব্য: পঞ্চভূত (১৩০৪) গ্রন্থের নরনারী প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ।

৩৩। দ্রষ্টব্য: সাহিত্য (১৩১৪) গ্রন্থের সৌন্দর্য ও সাহিত্য প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ।

আবুল হাসান: শান্তি আর শিল্পের কবি

মামুন রশীদ

সাংবাদিক, দৈনিক মানব কণ্ঠ

বাংলাদেশ, ঢাকা

ঝিনুক নীরবে সহো

ঝিনুক নীরবে সহো, ঝিনুক নীরবে সহে যাও

ভিতরে বিষের বালি, মুখ বুঁজে মুক্তা ফলাও।

(ঝিনুক নীরবে সহো)

কবি আবুল হাসান। বাংলা কবিতার বিংশ শতাব্দীর ষাট দশকের কবি। জন্ম ১৯৪৭ সালের ৪ আগস্ট। উপমহাদেশের স্বাধীনতার মাত্র কয়েকদিন আগে জন্ম নেয়া এই কবি বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাত্র কয়েকবছর পর ২৬ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মাত্র কয়েক বছরের জীবনের তিনি দেখেছেন দুটি দেশের জন্ম। দুটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে তিনি দেখেছেন, স্বপ্ন থেকে গড়ে ওঠা একটি দেশে কিভাবে আবার রক্তাক্ত অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে নতুন জন্ম নেয়। আবার একইভাবে রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বদেশেও কিভাবে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, অপূর্ণতা আর হতাশা গ্রাস করে মানুষকে। কেমন করে স্বাধীনতার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মানুষকে আবার সংগ্রামী হয়ে উঠতে হয়। স্বাধীন দেশের পবিত্র মাটি আবার কি করে রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে।

বাংলা কবিতার ইতিহাসের যে সময়ে বেড়ে উঠেছেন আবুল হাসান, সে সময়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর পরিবেশ তাকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছে ষাট দশকের অন্য কবিদের মতোই। তিনিও ষাটের উত্তাল সময়ের পথিক হিসেবে নিজের কবিতায় তুলে এনেছেন সেই সময়কে। তবে তার সময়ের অন্য কবিদের মতো আবুল হাসানের কবিতায় উচ্চস্বর নেই, বরং তিনি মৃদুস্বরে তুলে এনেছেন আ্ত্তকেন্দ্রিক দুঃখবোধ। যা তার নিঃসঙ্গচেতনারও স্মারক, তবে এই নিঃসঙ্গচেতনা শুধু একা আবুল হাসানের নয়, বরং তা হয়ে ওঠে তার কবিতার সব পাঠকের। ফলে মাত্র এক দশকের কাব্যচর্চার আয়ুতেও তিনি হয়ে উঠেছেন বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক মাইল ফলক। তার কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা মাত্র তিনটি। রাজা যায় রাজা আসে, যে তুমি হরণ করো ও পৃথক পালঙ্ক এই তিনটি কাব্যগ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতার পর, স্বাধীন বাংলাদেশে।

মাত্র ২৮ বছরের জীবনে আবুল হাসান অনেক অবিস্মরণীয় কবিতা রচনা করে নিজে যেমন স্মরণীয় হয়েছেন, তেমনি বাংলা কবিতাকেও সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি সবসময়ই আশার আলো দেখেছেন, নিজের ভেতরে, সমাজের ভেতরে, মানুষের ভেতরে। স্বপ্ন দেখেছেন নতুনের। ফলে তার কবিতা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে সময় এবং সম্ভবনার কথা। ষাটের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা, শোষণ আর বঞ্ছনার সঙ্গে যখন যোগ হয়েছে নতুন দেশের স্বপ্ন, তখন তিনিও স্বপ্ন দেখেছেন স্বাধীনতার। তবে তার সেই স্বপ্ন দেখার মধ্যে যেমন রয়েছে নিজেকে জড়িয়ে রাখার অনুভূতি তেমনি রয়েছে সমগ্রকে ধরে রাখার আকুলতা। তাই ষাটের দশকের কবিতার অস্থিরতার বিপরীতে তার কবিতা হয়ে উঠে শৈল্পিক প্রকাশ-

লক্ষ্মী বউটিকে

আমি আজ আর কোথাও দেখিনা,

হাটি হাটি শিশুটিকে

কোথাও দেখিনা,

কতগুলি রাজহাঁস দেখি

নরম শরীর ভরা রাজহাঁস দেখি,

কতগুলি মুখস্থ মানুষ দেখি, বউটিকে কোথাও দেখিনা

শিশুটিকে কোথাও দেখিনা !

তবে কি বউটি রাজহাঁস ?

তবে কি শিশুটি আজ

সবুজ মাঠের সূর্য, সবুজ আকাশ ?

অনেক রক্ত যুদ্ধ গেলো,

অনেক রক্ত গেলো,

শিমুল তুলোর মতো

সোনারূপো ছড়ালো বাতাস ।

ছোটো ভাইটিকে আমি

কোথাও দেখিনা,

নরোম নোলক পরা বোনটিকে

আজ আর কোথাও দেখিনা !

কেবল পতাকা দেখি,

কেবল উত্সব দেখি ,

স্বাধীনতা দেখি,

তবে কি আমার ভাই আজ

ঐ স্বাধীন পতাকা ?

তবে কি আমার বোন, তিমিরের বেদীতে উত্সব ?

(উচ্চারণগুলি শোকের )

কবিতায় আবেগের ব্যবহার প্রয়োজন, আবেগের যথার্থ প্রকাশ ছাড়া অনুভূতির তীব্রতা স্পষ্ট করা সম্ভব না, তবে সেই আবেগের ব্যবহার যেখানে সংযত, সেখানেই কবিতার পূর্ণতা। সেই কবিই সময়কে, নিজের দশককে উতরে যান, যিনি আবেগের সঙ্গে নিজের মেধা ও মননের সেতু তৈরি করে তাকে প্রকাশ করতে পারেন। ভাবাবেগই শুধু নয়, বরং বুদ্ধির দীপ্তিও কবিতাকে আচ্ছন্ন করে রাখলেই শুধু অনবদ্য কবিতার জন্ম হতে পারে। অপ্রাপ্তি জনিত হতাশা আর দুঃখের চাদের জড়ানো অনুভূতিকে আবুল হাসান শুধু আবেগ নয়, বরং তার সঙ্গে মেধা ও মননের সেতু বন্ধন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে তার কবিতা হয়ে উঠেছে ষাটের ভিন্নস্বর। জীবনানন্দ দাশের প্রভাবকে আ্ত্তস্থ করেই তিনি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন, ফলে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের বাংলা কবিতায় আবুল হাসান অবশ্য পাঠ্য নামের তালিকায় যুক্ত হয়েছেন। বৈশ্বিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের অপ্রাপ্তি, হতাশা আর দুঃখবোধকে তিনি নিখুঁত শিল্পীর তুলিতে প্রকাশ করেন, ফলে পাঠকের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি হয় আবুল হাসানের কবিতার-

মৃত্যু আমাকে নেবে, জাতিসংঘ আমাকে নেবেনা,

আমি তাই নিরপেক্ষ মানুষের কাছে, কবিদের সুধী সমাবেশে

আমার মৃত্যুর আগে বলে যেতে চাই,

সুধীবৃন্দ ক্ষান্ত হোন, গোলাপ ফুলের মতো শান্ত হোন

কী লাভ যুদ্ধ করে? শত্রুতায় কী লাভ বলুন?

আধিপত্যে এত লোভ? পত্রিকা তো কেবলি আপনাদের

ক্ষয়ক্ষতি, ধ্বংস আর বিনাশের সংবাদে ভরপুর

মানুষ চাঁদে গেল, আমি ভালোবাসা পেলুম

পৃথিবীতে তবু হানাহানি থামল না।

পৃথিবীতে তবু আমার মতোন কেউ রাত জেগে

নুলো ভিখিরীর গান, দারিদ্রের এত অভিমান দেখল না।

আমাদের জীবনের অর্ধেক সময় তো আমরা

সঙ্গমে আর সন্তান উত্পাদনে শেষ করে দিলাম,

সুধীবৃন্দ, তবু জীবনে কয়বার বলুন তো

আমরা আমাদের কাছে বলতে পেরেছি,

ভালো আছি, খুব ভালো আছি?

(জন্ম মৃত্যু জীবনযাপন )

আবুল হাসানের কবিতায় উঠে এসেছে মানুষ। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’ মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাসের এই মানুষ ভজনাই আবুল হাসানের কবিতার প্রাণ। তার সময়ের কবিদের কবিতায় উঠে এসেছে রাজনৈতিক চেতনা, আবুল হাসানও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে তিনি সরকারি রাজনীতিকে কবিতার বিষয় করে তোলেন নি, স্পষ্ট করে বললে তার কবিতা রাজনৈতিক শ্লোগান হয়ে ওঠে নি, বরং ব্যক্তি মানুষের মনের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকতার যোগ ঘটিয়ে তিনি এক্ষেত্রে শিল্পকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ তিনি জানতেন, বিশ্বাস করতেন, ‘শিল্প তো নিরাশ্রয় করে না, কাউকে দুঃখ দেয় না কোনো হীন সিদ্ধান্তের মতো’। (স্বাতীর সঙ্গে এক সকাল)। তিনি শিল্পকে বলেছেন স্বাতীর বুকের মানবিক হূদপিণ্ড। ‘তাই আমি তার হূিপণ্ডে বয়ে যাই চিরকাল রক্তে আমি

শান্তি আর শিল্পের মানুষ!’ এই মানবিক বোধই আবুল হাসানকে কবি করে তুলেছে। মানবিকতার প্রতি বিশ্বাস থেকেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন শিল্পের মানুষ-

দুঃখের এক ইঞ্চি জমিও আমি অনাবাদী রাখবো না আর আমার ভেতর

সেখানে বুনবো আমি তিন সারি শুভ্র হাসি, ধৃতপঞ্চইন্দ্রিয়ের

সাক্ষাত্ আনন্দময়ী একগুচ্ছ নারী তারা কুয়াশার মতো ফের একপলক

তাকাবে এবং বলবে,‘তুমি না হোমার? অন্ধ কবি ছিলে? তবে কেন হলে

চক্ষুষ্মান এমন কৃষক আজ? বলি কী সংবাদ হে মর্মাহত রাজা?

এখানে আঁধার পাওয়া যায়? এখানে কি শিশু নারী কোলাহল আছে?

রূপশালী ধানের ধারণা আছে? এখানে কি মানুষেরা সমিতিতে মালা

পেয়ে খুশী?

গ্রীসের নারীরা খুব সুন্দরের সর্বনাশ ছিলো। তারা কত যে উল্লুক!

ঊরুভুরুশরীর দেখিয়ে এক অস্থির কুমারী কত সুপুরুষ যোদ্ধাকে

তো খেলো!

আমার বুকের কাছে তাদেরও দুঃখ আছে, পূর্বজন্ম পরাজয় আছে

কিন্তু কবি তোমার কিসের দুঃখ? কিসের এ হিরন্ময় কৃষকতা আছে?

মাটির ভিতরে তুমি সুগোপন একটি স্বদেশ রেখে কেন কাঁদো

বৃক্ষ রেখে কেন কাঁদো? বীজ রেখে কেন কাঁদো? কেন তুমি কাঁদো?

নাকি এক অদেখা শিকড় যার শিকড়ত্ব নেই তাকে দেখে তুমি ভীত আজ?

ভীত আজ তোমার মানুষ বৃক্ষশিশু প্রেম নারী আর নগরের নাগরিক ভূমা?

বুঝি তাই দুঃখের এক ইঞ্চি জমিও তুমি অনাবাদী রাখবে না আর

এম্ফিথিয়েটার থেকে ফিরে এসে উষ্ণ চাষে হারাবে নিজেকে, বলবে

ও জল, ও বৃক্ষ, ও রক্তপাত, রাজনীতি ও নিভৃতি, হরিত্ নিভৃতি

পুনর্বার আমাকে হোমার করো, সুনীতিমূলক এক থরোথরো দুঃখের

জমিন আমি চাষ করি এদেশের অকর্ষিত অমা!

(কালো কৃষকের গান)

আবুল হাসান প্রেমিক কবি। ভালবেসেই তিনি দায়বদ্ধ। আর এই দায়বদ্ধতাকে তিনি প্রেমিক সত্ত্বার বাইরে নিয়ে যান নি। প্রেমই তাকে যেমন মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলেছে, তেমনি প্রেমই তাকে করে তুলেছে দ্রোহী। তবে তার এই দ্রোহ একজন প্রেমিকের মতোই নতমুখী, বিনম্র তার ভাষা, তা কেবলি যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে, দগ্ধ করে, পুড়ে পুড়ে খাঁটি হীরাতে পরিণত করে, কিন্তু সেই সেই থেকে কোন দ্রোহের আগুন মানুষের দিকে তার লেলিহান থাবা বাড়িয়ে দেয় না। তাকে গ্রাস করতে আসে না। ভালবাসলে মানুষ একা হয়ে যায়, নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। সে নিঃষঙ্গতার ছায়া একা একা গ্রাস করতে থাকে ভালবাসার মানুষকে। একা একা ভাবাতে থাকায়, কল্পনার পাখা মেলতে থাকে, সেখানে সৌন্দর্যের কল্পনা থাকে। থাকে অতৃপ্তির দুঃখবোধ। কিন্তু সেই প্রেমে, সেই কল্পনায় অনিষ্ঠের কালো ছায়া থাকে না। আবুল হাসানও কবিতায় ব্যক্তির অপ্রাপ্তির সেই দুঃখবোধ থেকেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন। অপূর্ণতার পূর্ণতা খুঁজেছেন। যন্ত্রণামুখর জীবনের ভেতর থেকে একমুঠো রোদ খুঁজেছেন। নিঃসঙ্গতাকে ভাষায় রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রকাশ যন্ত্রণায় উন্মুখ হয়েছেন-

এ ভ্রমণ আর কিছু নয়, কেবল তোমার কাছে যাওয়া

তোমার ওখানে যাবো, তোমার ভিতরে এক অসম্পূর্ণ যাতনা আছেন,

তিনি যদি আমাকে বলেন, তুই শুদ্ধ হ’ শুদ্ধ হবো

কালিমা রাখবো না!

এ ভ্রমণ আর কিছু নয়, কেবল তোমার কাছে যাওয়া

তোমার ওখানে যাবো; তোমার পায়ের নীচে পাহাড় আছেন

তিনি যদি আমাকে বলেন, তুই ্লান কর

পাথর সরিয়ে আমি ঝর্ণার প্রথম জলে ্লান করবো

কালিমা রাখবো না!

এ ভ্রমণ আর কিছু নয়, কেবল তোমার কাছে যাওয়া

এখন তোমার কাছে যাবো

তোমার ভিতরে এক সাবলীল শুশ্রুষা আছেন

তিনি যদি আমাকে বলেন, তুই ক্ষত মোছ আকাশে তাকা

আমি ক্ষত মুছে ফেলবো আকাশে তাকাবো

আমি আঁঁধার রাখবো না!

এ ভ্রমণ আর কিছু নয়, কেবল তোমার কাছে যাওয়া

যে সকল মৌমাছি, নেবুফুল গাভীর দুধের সাদা

হেলেঞ্চা শাকের ক্ষেত

যে রাখাল আমি আজ কোথাও দেখি না তোমার চিবুকে

তারা নিশ্চয়ই আছেন!

তোমার চিবুকে সেই গাভীর দুধের শাদা, সুবর্ণ রাখাল

তিনি যদি আমাকে বলেন, তুই কাছে আয় তৃণভূমি

কাছে আয় পুরনো রাখাল!

আমি কাছে যাবো আমি তোমার চিবুক ছোঁবো, কালিমা ছোঁবো না!

(তোমার চিবুক ছোঁবো, কালিমা ছোঁবো না)

আবুল হাসান জানতেন বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একা। তাই তিনি বলতে পেরেছেন, ‘অবশেষে জেনেছি মানুষ একা! জেনেছি মানুষ তার চিবুকের কাছেও ভীষণ অচেনা ও একা!’ সেই অচেনা মানুষের চেনা দুঃখগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে তাই তিনি ছিলেন নিপুন কারিগর। ফলে তার কবিতা হয়ে উঠেছে চিত্রকল্পময়। তিনি কবিতায় ছবি নির্মাণ করেন। ফুঁটিয়ে তোলেন দৃশ্য। ফলে তার কবিতা হয়ে ওঠে দৃশ্যের বর্ণিল উপস্থাপন। কবিতাকে তার এই চিত্রময় করে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি কখনোই অসম্ভব, অবাস্তব কোন ছবি ব্যবহার করেননি। চির পরিচিত দৃশ্যকেই তিনি বর্ণনার গুণে করে তুলেছেন আলাদা। দেখার এবং ভাবনার চোখকে মিলিয়ে তিনি কবিতায় দৃশ্য এঁকেছেন। তাই তার কবিতা কখনোই কষ্ট কল্পনা নয়। বরং নিজেকে, নিজের পরিবেশকে মিলিয়ে দেখার সুযোগ থেকে পাঠকও একা্ত হয়ে ওঠে তার কবিতার সঙ্গে। নিজেকে খুঁজে পেতে সাহায্য করে আবুল হাসানের কবিতা। ফলে কবির মতো আলোড়িত হয়ে ওঠে তার পাঠকও। মানুষের অধিকার আর অধিকার বঞ্চনার কথামালা আবুল হাসানকে পীড়া দিয়েছে। যে ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন মানুষ দেখেছিল। তার বাস্তবায়ন আজো হয় নি। স্বাধীনতা যুদ্ধের অল্প পরেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে দারিদ্রতা আর ক্ষুধা তার ভয়াল থাবা বসায়। সেই দুঃখ, সেই কষ্ট আবুল হাসানকে ছুঁয়ে যায়-

আমি জানিনা দুঃখের কী মাতৃভাষা/ভালোবাসার কী মাতৃভাষা/বেদনার কী মাতৃভাষা/যুদ্ধের কী মাতৃভাষা।/ আমি জানিনা নদীর কী মাতৃভাষা/ নগ্নতার কী মাতৃভাষা/একটা নিবিড় বৃক্ষ কোন ভাষায় কথা বলে এখনো জানিনা।/শুধু আমি কোথাও ঘরের দরোজায় দাঁড়ালেই আজো/সভ্যতার শেষ মানুষের পদশব্দ শুনি আর/কোথাও করুণ জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে,/আর সেই জলপতনের শব্দে সিক্ত হতে থাকে/ সর্বাঙ্গে সবুজ হতে থাকে আমার শরীর।/ সর্বাঙ্গে সবুজ আমি কোথাও ঘরের দরোজায় দাঁড়ালেই আজো/ পোষা পাখিদের কিচিরমিচির শুনি/শিশুদের কলরব শুনি/সুবর্ণ কঙ্কন পরা কামনার হাস্যধ্বনি শুনি !/ঐযে নষ্ট গলি, নিশ্চুপ দরোজা/ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, গণিকারা-/মধ্যরাতে উলঙ্গ শয্যায় ওরা কীসের ভাষায় কথা বলে?/ঐযে কমলা রং কিশোরীরা যাচ্ছে ইশকুলে/আজো ঐ কিশোরীর প্রথম কম্পনে দুটি হাত রাখলে/রক্তে স্রোত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে, শব্দ হয়, শুনি/কিন্তু আমি রক্তের কী মাতৃভাষা এখনও জানিনা !/ বেদনার কী মাতৃভাষা এখনো জানিনা!/ শুধু আমি জানি আমি একটি মানুষ,/আর পৃথিবীতে এখনও আমার মাতৃভাষা, ক্ষুধা ! (মাতৃভাষা)

সময়ের প্রয়োজনেই আবুল হাসানের কবিতা হয়ে উঠেছে ব্যতিক্রম। সময়ের তীব্রতম প্রকাশ হয়েও তার কবিতা কখনোই হয়ে ওঠেনি রাজনীতির ভাষা। তিনি দেখেছেন, অনুভূতির তীব্রতা দিয়ে উপলব্দি করেছেন, ‘রাজা যায় রাজা আসে’ কিন্তু কোন পরিবর্তন আসে না। সেই ক্ষোভ, অপ্রকাশ্য বেদনাকেই তিনি কবিতার অংশ করে তুলেছেন। সরাসরি রাজনৈতিক কর্মী না হয়েও তিনি ছিলেন রাজনীতি সচেতন। তাই সময়কে এড়িয়ে যাননি তিনি। তবে শুধু সাময়িক বা সমকালীন বোধই নয়, তিনি চিরকালীনতাকেই ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কবিতা সম্পর্কে কবি শামসুর রাহমান ‘আবুল হাসান রচনা সমগ্র’র ভূমিকায় বলেন, ‘আবুল হাসান মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত কবি, কবি ছাড়া আর কিছুই নন। তার প্রতিটি নিঃশ্বাসে বয়ে গেছে কবিতা। তার এলোমেলো জীবনের ছাপ পড়েছে তার কবিতাতেও। এই এলোমেলোমি তার কবিতার দুর্বলতা এবং শক্তি।’... ‘গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের মিলিত অভিজ্ঞতা তার কবিতাকে বর্ণাঢ্য, সমৃদ্ধ করেছে। তিনি নৈঃসঙ্গ এবং দীর্ঘশ্বাসের কবি।’ এই নিঃষঙ্গতা এই দীর্ঘশ্বাস আজন্ম তাড়িয়ে বেরিয়েছে আবুল হাসানকে। আর এ থেকেই তার কলমে বেরিয়ে এসেছে-

আমার এখন চাঁদ দেখলে খারাপ লাগে

পাখির জুলুম, মেঘের জুলুম, খারাপ লাগে

কথাবর্তায় দয়ালু আর পোশাকে বেশ ভদ্র মানুষ

খারাপ লাগে,

এই যে মানুষ মুখে একটা মনে একটা. . .

খারাপ লাগে

খারাপ লাগে

(আমি অনেক কষ্টে আছি)

আবুল হাসান ছিলেন হূদয়ের ‘অনিচ্ছুক দাস’। তার কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে ছড়িয়ে রয়েছে আবেগ। যে আবেগের মধ্যে ধরা থাকে, ‘লাবণ্য, উজ্জ্বলতা আর মায়া’। আর এ সবের মিলিত নাম আবুল হাসান। তিনি ভালবেসেছিলেন, ‘ফুল, মোমবাতি, শিরস্ত্রাণ, আর আলোর ইশকুল’। তিনি কবিতায় হূদয় খুঁড়ে বেদনা জাগিয়েছেন, সেই বেদনা ছুঁয়ে গেছে পাঠককে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫ মাত্র দশকের বছরের কাব্যসাধনায় মগ্ন ছিলেন তিনি। শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও এত কম সময় লেখার জগতে থেকে পাঠকপ্রিয়তা এবং সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা লেখকের সংখ্যা কম নয়, আবুল হাসান এই তালিকায় এক উজ্জ্বল নাম। কবিতায় শুধু মুহূর্তের উচ্ছাস নয়, তাকে সময় উত্তীর্ণ করে দেবার প্রচেষ্টা থেকেই তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়। বর্ণনা্তক কবিতা রচনার যে ধারার মধ্য দিয়ে আবুল হাসান কাব্যসাধনা করেছেন, তাই তাকে ষাটের পৃথক পালঙ্কে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর মধ্য দিয়েই তিনি হয়ে উঠেছেন, শিল্প আর শান্তির মানুষ। ফলে শুধু ষাটের দশকের কবিতার ভুবনেই নয়, বাংলা কবিতার ইতিহাসেও তার স্থান অনন্য।

শামসুর রাহমানের কবিতায় ঐতিহ্য

কাজী মহম্মদ আশরাফ

প্রাবন্ধিক, বাংলাদেশ

ঢাকা

শামসুর রাহমানের উপাধির অভাব নেই। বাংলা কবিতার রাজপুত্র, নাগরিক কবি, কবিশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। তার অভিধা যাই হোক, বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি কবিতা রচনার অধিকারী হিসেবে তার একটা স্থান আছে। কবিতার সংখ্যা বেশি বলেই তাকে বড় কবি বলা হবে তা নয়। বরং তার হাজার হাজার কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবিতার সংখ্যা কম। অবশিষ্টগুলোকে কী বলা যায়, নিকৃষ্ট কবিতা? হুমায়ুন আজাদ ১৯৮২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত সতেরটি কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতা নিয়ে গবেষণা করে জানিয়েছেন পরের বইগুলোতে “নতুনভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটেনি।” এরপরে সংখ্যায় আরও প্রায় আড়াইগুণ কবিতার বই বেরিয়েছে তার। সে সব কবিতা সম্পর্কে ভালোভাবে গবেষণা হতে পারে। তবে শামসুর রাহমানের কবিতার পরিমাণগত আধিক্যের কারণে তার সম্পর্কে কিছু সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়। যেমন;

* শামসুর রাহমান ঢাকা শহরে জন্ম নেওয়া বড় কবি।
* তার কবিতার পরিমাণ সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়েও বেশি।
* ঢাকা ছাড়া আর কোনও বড় শহরে স্থায়ীভাবে থাকার অভিজ্ঞতা তার নেই। তাই তাকে ঢাকাকেন্দ্রিক কবি বলা যায়। এ শহরেই তার মৃত্যু।
* ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষার্থী হওয়ার কারণে এবং পাশ্চাত্যকাব্যের অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন বলে তার কবিতা দেহে ও মনে আধুনিক।
* ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের বা গোষ্ঠীর ছিলেন না বলে তার মধ্যে রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা ছিল না।
* একইভাবে তিনি কোনও দার্শনিক কিংবা অর্থনৈতিক অথবা অন্য কোনও মতাদর্শে অন্ধ ছিলেন না। সর্বদাই তিনি মুক্তচিন্তা ও স্বাধীন কর্মপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন।
* স্বভাবে নম্র এবং স্বল্পভাষী ছিলেন বলে তার কাছ থেকে মানুষ আঘাত পেয়েছে কম, তার শত্রুর সংখ্যাও কম।
* ধর্মচিন্তায় ও আচারে তার মধ্যে কোনও প্রকার বাড়াবাড়ি ছিল না। পক্ষে না, বিপক্ষেও না।
* ব্যক্তিগতভাবে বাংলাকবিদের ঐতিহ্যগত বোহেমিয়ান স্বভাব তার মধ্যে ছিল না। পেশাগত দায়িত্ব কিংবা সামাজিক কর্তব্য থেকে বিচ্যুত ছিলেন না। সংসারী হিসেবে সফল। স্বামী এবং পিতা হিসেবে অভিযুক্ত ছিলেন না। শ্বশুর হিসেবেও পুত্রবধূর কাছে শ্রদ্ধেয় ছিলেন। কন্যাদের সত্পাত্রেই সম্প্রদান করেছেন। ঢাকা শহরে পিতার বাড়ি থেকে নিজের একটা স্থায়ী ঠিকানা গড়ে নিয়ে আমৃত্যু সেখানেই থেকেছেন।

ওপরের বৈশিষ্ট্য শামসুর রাহমানকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। যেহেতু তিনি দীর্ঘকাল কবিতা রচনা করেছেন এবং তা পরিমাণে অজস্র, তাই তা নানামুখি গবেষণার দাবি রাখে। রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র সাহিত্যপ্রাসাদে অনেকগুলো কক্ষ ছিল; প্রবেশপথও অনেক। কিন্তু শামসুর রাহমানের প্রধান কর্মক্ষেত্র কবিতা। বলা যায় একমাত্র কবি পরিচয়ই তার প্রাপ্য। অন্য রচনার পরিমাণ সামান্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতা রচনার কাল প্রায় পঁয়ষট্টি বছর। তার বয়স ও জীবনের নানা বাঁকে কবিতার গতিপ্রকৃতিও নানাভাবে বাঁক নিয়েছে। বহু গবেষণায় তা এখন পাঠকের কাছে স্পষ্ট। যেমন, ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ থেকে ‘মানসী’ পর্ব। ‘সোনার তরী’ থেকে ‘চিত্রা’ কিংবা ‘চিত্রা’ থেকে ‘বলাকা’ ইত্যাদি নানা পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। শামসুর রাহমানের কবিতায়ও দীর্ঘকালের বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু সেভাবে পৃথক করে গবেষণা করা হয় নি। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিচ্ছিন্ন কাজ হয়েছে। হুমায়ুন আজাদ তার ‘শামসুর রাহমান: নিঃসঙ্গ শেরপা’ গ্রন্থে আশির দশকের ‘উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ’ (১৯৮২) কাব্য পর্যন্ত সতেরটি কাব্য থেকে কবিতা গ্রহণ করেছেন। হুমায়ুন আজাদ নিজের রুচিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, শামসুর রাহমানের কবিতা প্রাধান্য দেন নি। আর জীবিত অবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পর্কনির্ভর রচনা মৃত্যুর পরে অনেক সময় ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

**দুই**

শামসুর রাহমান নগরে জীবন যাপন করলেও কবিতায় গ্রামকে ধরার চেষ্টা করেছেন। অতীতকে ধরার চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্যের আধুনিক কবিদের দ্বারা প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন, এর মধ্যে রবার্ট ফ্রস্টের কথা বলা যায়। যার কবিতা তিনি বেশ যত্নের সঙ্গে অনুবাদ করেছেন। দু’বার দুই নামে দুটি বই প্রকাশ করেছেন, ‘রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা’ এবং ‘রবার্ট ফ্রস্টের নির্বাচিত কবিতা’ নামে। অনেক সময় শামসুর রাহমানের কবিতাকে ফ্রস্টের কবিতা দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত বলে মনে হয়। প্রভাব থাকা স্বাভাবিক, তবে তার মৌলিকতা নিজস্ব রঙের আকাশের মতো সত্য। মঙ্গলের আকাশ যেমন বৃহস্পতির আকাশের মতো নয়। ঠিক তেমনি শামসুর রাহমানের নিজস্ব জমি এবং আকাশ অবশ্যই ফ্রস্টের জমি এবং আকাশ থেকে পৃথক।

তবে শামসুর রাহমান শুধু পশ্চিমা আধুনিক কবিদের কাব্যচিন্তা ধারা গ্রহণ করেন নি, পাশ্চাত্য প্রভাবিত বাঙালি কবিদরে দ্বারাও যথেষ্ট প্রভাবিত ছিলেন। বিভিন্ন কবিতায় তিনি জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের ‘চয়নিকা’ তার ছোটবেলার প্রিয় বই ছিল। তার অগ্রজ নিয়মিত সেখান থেকে কবিতা আবৃত্তি করতেন। পরে জীবনানন্দ দাশের ‘ধূসর পা্লুলিপি’ হাতে পাওয়ার পরে কবিতার পাঠক হিসেবে একবারেই বদলে যান তিনি। এর পরে বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র প্রমুখের ব্যক্তিত্ব ও রচনার সান্নিধ্যে এসে সমকালীন বিশ্বকবিতার পাঠক এবং লেখক হয়ে ওঠেন। আধুনিক কাব্যচিন্তায় ঐতিহ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঐতিহ্য বলতে সাধারণত ইতিহাসের উপাদান, কিংবদন্তী, লোকশ্রুতি, যাপিত জীবনের ধারাবাহিকতা ইত্যাদি বোঝায়। রোমান্টিক যুগের কৃত্রিম ভাব, ভাষা ও কাব্যানুষঙ্গ নিয়ে লেখা কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটস, বায়রন, ব্রাউনিংদের কবিতার জগত্ থেকে যেমন পশ্চিমের এলিয়ট, ইয়েটস, এজরা পাউন্ড, অডেন, স্পেন্ডার, ডিলান টমাস, লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার প্রমুখ কবি বেরিয়ে এসেছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক জগত্ থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিরিশোত্তর কবিরা। আর এ ঘটনা শামসুর রাহমানের জীবনে ‘চয়নিকা’ ছেড়ে ‘ধূসর পা্লুলিপি’ গ্রহণও একটি মাইলফলক হয়ে আছে।

দেশি এবং বিদেশি আধুনিক কবিদের কবিতা এবং কাব্যচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত শামসুর রাহমান তার কবিতায় ঐতিহ্যের সচেতন ব্যবহার করেছেন। নানা কবি নানাভাবে ঐতিহ্যের ব্যবহার করে থাকেন। শামসুর রাহমান এর কবিতায় ব্যবহূত ঐতিহ্যের প্রধানত দুইটি রূপ লক্ষ্য করা যায়। যেমন;

* নাগরিক ঐতিহ্য
* লোকজ ঐতিহ্য

এছাড়া শামসুর রাহমান ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এবং আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সচেতন পাঠক হওয়ার কারণে বিদেশি ঐতিহ্যও ব্যবহার করেছেন প্রচুর। বর্তমান নিবন্ধে শুধু বাংলার ঐতিহ্যের দিকটি তুলে ধরা হল। ব্যাপক গবেষণায় তার এ সবগুলো ধারার ঐতিহ্যের মধ্যেও অনেক শাখা-উপশাখা খুঁজে পাওয়া যাবে। বর্তমান রচনায় সে ধরনের গভীর অনুসন্ধানের সুযোগ না থাকলেও কিছুটা ধারণা লাভ করা যাবে।

**নাগরিক ঐতিহ্য**: শামসুর রাহমানকে নাগরিক বলা বলা হয়। এ নাগরিকতা শুধু আধুনিকতার প্রতীক নয়। কারণ তিনি শুধু আধুনিক ঢাকার নাগরিক ঐতিহ্য নিয়ে লেখেন নি। ঢাকা চারশ বছর আগে ফারসিভাষী মুঘল শাসকদের হাতে গড়ে ওঠা একটি শহর। এখানে মুঘলদের সংস্কৃতির প্রভাব আছে। এর পরে উর্দুভাষী নবাবরা ঢাকাকে নগর হিসেবে গড়ে তোলেন। তাদেরও বিরাট অবদান আছে। আছে মহাকালের কাছে রেখে যাওয়া তাদের সংস্কৃতির অবশিষ্ট। এর পরে ইংরেজিভাষী ব্রিটিশরা চেষ্টা করেছে নিজেদের মতো করে গড়ে তুলতে। সাতচল্লিশে দেশ বিভাগের পরে ভারত থেকে আসা উর্দুভাষী বিহারীরা আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের সে ক্ষমতা ছিল না। উদ্বাস্তু বলে, হয়তো শিক্ষার অভাব ছিল বলে এবং ঢাকার নবাবদের মতো খান্দানি ছিল না বলে বিহারিরা এখানে তাদের সংস্কৃতির ছড়িয়ে দিতে পারে নি। ইদানীং মহরমের তাজিয়া মিছিলকে অনেকে বিহারিদের অবদান বলে ভুল করেন, আসলে বিহারিরা এদেশে আসার আগেও এখানে মহরমের মিছিল হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মুঘল শাসনকালে শিয়া সম্প্রদায়ের অনেক রাজকর্মচারী এখানে বাস করতেন। তাদের অবদান।

আরেকটা প্রধান কারণ ইতোমধ্যে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী জেগে উঠেছে। শ্রেণীস্বার্থে তারা গলি থেকে রাজপথ এবং কৃষক-প্রজাদের আইল থেকে সংসদ পর্যন্ত নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। একাত্তরের পরে ঢাকা হয়ে ওঠে শুধুই বাংলাভাষীদের মহানগর। শামসুর রাহমান এ শহরে জন্ম নেওয়া এবং এখানেই মৃত্যুবরণকারী প্রধান কবি। তার আগে ঢাকার জনপ্রিয় কবি ছিলেন ভাওয়ালের গোবিন্দ চন্দ্র দাস। সমকালে গোবিন্দ দাসও ঢাকায় যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন। শিক্ষাস্বল্পতা এবং আর্থিক কষ্ট এ কবিকে পরবর্তী শতাব্দী পর্যন্ত টেনে আনতে পারেনি। না হয় ব্যক্তিগতভাবে প্রভাবশালী হলে বলাই যেত যে, তিরিশি কবিদের মতো দেহজ কামনা বাসনা নিয়ে অর্থাত্ রবীন্দ্রনাথের নারীরূপী দৈবী নায়িকা ছেড়ে তিনিই প্রথম লিখেছিলেন ব্যক্তিনারীর প্রতি পুরুষের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার কথা,

আমি তাকে ভালবাসি অস্থি মাংসসহ

সকলি অমৃত তার মিলন বিরহশামসুর রাহমানকেও ঢাকার এই স্বল্পশিক্ষিত কবির শিল্পাদর্শ দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত বলা যেত। তবে শামসুর রাহমান চারশ বছরের পুরনো ঢাকার ঐতিহ্য ধারণ করেছেন। জেমস জয়েস যেমন ডাবলিনের, ওরহান পামুক যেমন ইস্তান্বুলের তেমনি শামসুর রাহমান ঢাকার একান্ত লেখক। ইস্তান্বুল মধ্যযুগীয় অটোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান খলনায়ক। পামুক সেই শহরকে প্রিয় বলেন, সংস্কৃতি লালন করেন কিন্তু বিস্বাদের ইতিহাস অস্বীকার করেন না। করলে স্বজাতির হাতে নিহত লাখ লাখ আর্মেনীয়দের নিয়ে সাহিত্য রচনা করে কারাদ্লে দ্লিত হতেন না। ভাগ্য ভালো নোবেল পুরস্কার পেয়ে দ্ল থেকে রেহাই পেয়েছেন।

১৬০৮ সালে গড়ে ওঠা ঢাকা নিয়ে আজ আমরা যারা প্রগতিশীল বলে পরিচিতরা গর্ব করি, গবেষণা করি আমাদের ভুলে গেলে অন্যায় হবে যে এ ঢাকার ইতিহাস সরল এবং একরৈখিক নয়। আজকের ঢাকা একজাতির (এখানে অন্যজাতি কিংবা উপজাতির অধিকার সামান্য), প্রধানত এক ধর্মের (অন্যেরা সংখ্যালঘু) এবং এক ভাষার (অন্যভাষীদের জন্য এখানে কোনও প্রকার সুযোগ নেই)। কিন্তু ঢাকার চারশ বছরের ইতিহাস বিচিত্র। ফারসিভাষীদের হাতে গড়া, উর্দুভাষীদের হাতে উন্নত হওয়া এবং ইংরেজিভাষীদের হাতে স্বীকৃতি লাভের পরে বাঙালিরা এ ঢাকা পেয়েছে। এ তো গেল ভাষাভাষীদের কথা। এবার আসা যাক ধর্মের কথায়। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, এ ঢাকা কিন্তু অসাম্প্রদায়িকদের হাতে গড়ে ওঠেনি। বরং বিপরীত ঘটনাই সত্য। সাম্প্রদায়িকতার মধ্য দিয়েই এ শহরের উত্থান। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ না হলে ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা পেত না। সাম্প্রদায়িক সংগঠন মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠাতা নবাবদের হাতেই এ শহর বেড়ে উঠেছে। আবদুল গনি, আহসানউল্লাহ, সলিমুল্লাহসহ অনেক নবাবের অবদান। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় আবার তা মর্যাদা হারায়। এর পরে ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে আবার বঙ্গভঙ্গ হয়েছে বলেই ঢাকা আবার রাজধানী শহরের মর্যাদা ফিরে পায়। সোহরাওয়ার্দী-হাশিম-শরত্বসুর আদর্শে যদি বঙ্গভঙ্গ না হয়ে অখ্ল বঙ্গ থেকে যেত তবু ঢাকা আজকের মর্যাদা পেত না; কারণ রাজধানী কলকাতাতেই হতো। আর জাতির কথা বললে বলতে হয় মুঘল, পাঠান, ইংরেজ, পর্তুগিজ, ফরাসি, গ্রিক, আর্মেনীয়সহ বিশ্বের বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে এ শহরটি ওরহান পামুকের ইস্তান্বুলের মতো আন্তর্জাতিক শহর হিসেবে বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত; কিন্তু সব শেষে ঘুম থেকে জেগে ওঠা বাঙালি মুসলমানরা নানা রকম সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পোস্টার দিয়ে ঢেকে ফেলেছে এই শহরের দেয়ালগুলো।

মুঘল সংস্কৃতি থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক ঢাকার এই ইতিহাসের নানা উপাদান শামসুর রাহমানের কবিতায় ঐতিহ্য হিসেবে সরাসরি অথবা প্রচ্ছন্নভাবে উঠে এসেছে। যেমন, তার কবিতায় আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের বিশিষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। তিনি ফররুখ আহমদের মতো ধর্মীয়চেতনা নিয়ে এসব শব্দ ব্যবহার করেন নি। করেছেন সংস্কৃতির অংশ হিসেবে। আগেই বলা হয়েছে শামসুর রাহমান স্বল্পভাষী ছিলেন বলে তার শত্রু ছিল কম। না হয় অনেক বেড়ে যেত। তিনি তর্ক না করে নীরবে নিজের সাধনায় সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করে গেছেন। তার আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের ব্যবহার নিয়ে অনেকে আপত্তি করেছেন, কিন্তু শামসুর রাহমান তর্কে জড়ান নি; বরং ঢাকার বাস্তবতা তুলে ধরেছেন নিজের মতো করে।

শামসুর রাহমানের জন্ম ঢাকার ৪৬ মাহুতটুলির এক মাটির ঘরে। সে ঘরের কথা তিনি একটি কবিতায় উল্লেখ করেছেন।

আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম এই শহরের অখ্যাত এক গলির

এক মাটির ঘরে;

[সে এক মাটির ঘর: ই.আ.]

মাটির ঘরের কথা শুনলে আমাদের মতো এ যুগের পাঠকদের চোখে ভেসে ওঠে গ্রামের দৃশ্য। কিন্তু এটাই বাস্তবতা যে, সে যুগে ঢাকা শহরেও মাটির ঘর ছিল। একদিকে অভিজাত মুুঘল স্থাপত্য অন্যদিকে অতি সাধারণ মাটির ঘর। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক ঢাকায় আসার ধারবাহিকতা আছে শামসুর রাহমানের কবিতায়। মুঘলদের খান্দানি সংস্কৃতির কথা আজ অনেকটা মুছে গেলেও তার প্রথম কাব্যের কবিতায় তার কিছুটা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন,

... পেশোয়ারি বেদানার ফিকে-লাল রস

কাচের গেলাসে ভরা— গোধূলি-মদির।

[তার শয্যার পাশে: প্রগাদ্বিমৃআ]

শামসুর রাহমান শৈশবে যে ঢাকা পেয়েছেন তা ব্রিটিশ আমলাদের শহর। সেখানে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে খুবই ধীর গতিতে। কারণ ব্রিটিশদের রাজধানী ছিল কলকাতায়। আর শামসুর রাহমানের জন্মের অনেক আগেই সে রাজধানী চলে যায় দিল্লিতে। ঢাকা তখন একটি গুরুত্বহীন শহর। এ শহরে ঘোড়া ও ঘোড়ারগাড়ির প্রচলন ব্যাপক ছিল। আজও তা বিলুপ্ত হয় নি। এ মুঘল শহরের প্রতীক বলা যায় ঘোড়াকে। আর ঘোড়া শামসুর রাহমানের কবিতায় ইতিহাস, গতি, স্বপ্নময়তা প্রভৃতি চেতন-অবচেতন, বাস্তবতা-পরাবাস্তবতার ঘোর নিয়ে উঠে আসে। ঘোড়া, সহিস, আস্তাবল বার বার তার তার কবিতায় ঘুরে ফিরে আসে। যেমন,

শহর জেগেছে, দূরে ঘণ্টায় প্রাণের ধ্বনি,

রোগীর শরীরে নামল নিদ্রা হাসপাতালে,

যারা কোনো দিন ভুলেও পেল না আপন জন

ছেঁড়াখোঁড়া সেই কজন রাতের জুয়োশেষের

ক্লান্তিতে ফের ভিড়ল ধোঁয়াটে রেস্তোঁরায়।

আস্তাবলের সহিস ঘোড়ার পিঠ বুলোয়,

শীতের শুকনো ডালের মতোই ভিস্তি বুড়ো

কেঁপে কেঁপে তার জল-মসৃণ মশক বয়;

[আত্মজীবনীর খসড়া: প্রগাদ্বিমৃআ]

এখানে দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ ঢাকার আরেকটি ঐতিহ্য বা অনুষঙ্গ—মশক। বিশুদ্ধ পানীয় জল তখন মশকে ভরে সরবরাহ করা হতো। ঢাকায় স্থানীয় ভাষায় পানি সরবরাহকারীদের বলা হতো—ভিস্তিওয়ালা। শামসুর রাহমানের কবিতায় এ অনুষঙ্গটিও অনেকবার ব্যবহূত হয়েছে। ঢাকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জুয়াড়ীদের সহাবস্থান ছিল চিরকাল, তাও এখানে উঠে এসেছে।

আমার হূদয় যেন অতীতের বিধ্বস্ত নগর,

যেখানে প্রেতের মতো ভাঙা থামে নিশান্তের হাওয়া

মাথা কোটে অবিরাম, শূন্যতায় তারার বৈভব।

[একান্ত গোলাপ: প্রগাদ্বিমৃআ]

১৬২৪ সালে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে শাহজাদা খুররম— পরে তিনি হন সম্র্াট শাহজাহান— পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলায় এসে ঢাকা শহরে হামলা করেন। সুবাদারকে হত্যা করেন, কোষাধ্যক্ষকে হত্যা করে অর্থভা্লার লুঠ করেন। পুরো শহর অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করে দেন। সে সময় নিম্নবঙ্গের মানুষেরা ঢাকাকে দিল্লি-লাহোরের বিকল্প ভাবতে শুরু করেছিল। কিন্তু বিদ্রোহী শাহজাদা মানুষের স্বপ্ন ও আশা ধূলিসাত্ করে দেন। শামসুর রাহমান সে ধ্বংস ঢাকার কথাই যেন বলেছেন উদ্ধৃতিতে।

আমার পিরান নেই, পাগড়ি নেই লালমুখো সেই

উজিরের মতো, নাগরা নেই পায়। এখন দুপুরে

লেপ্টে আছে পৃথিবীর গায়।

[খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি: রৌ.ক.]

এখানে মুঘল ঢাকার ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে পিরান এবং লাল পাগড়িকে। উজিরের পায়ের নাগরাও একই ধরনের প্রতীক। খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরির বেশে মূলত কবির অসহায়ত্বের ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে কবিতাটিতে। মুঘল ঢাকার অভিজাত বাড়িঘর আর সেখানকার অধিবাসীদের ঘরোয়া বর্ণনা পাওয়া যায় পরের উদ্ধৃতিতে।

... বকুনির আগাগোড়া

বাপের আরবি ঘোড়া দাদার ইরানি তাঞ্জামের

ঝিলিমিলি জুড়ে রয়। বারান্দায় দাঁড়বন্দি তোতা

সেই বকবকানির ধৈর্যশীল শ্রোতা।

[একটি বালকের জন্য প্রার্থনা: নি.বা]

কবির চেতনায় এবং অবচেতনে চার শতাব্দীর ঢাকা স্থায়ী হয়ে আছে। তার আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশে আছে। মিশে আছে স্বপ্ন-কল্পনার সঙ্গেও। এখানে তিনি মুঘলদের নির্মিত পশ্চিমভারতীয় স্থাপনাগুলোর মতো অভিজাত স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন। যেমন,

এ-নগরে কোলাহল চেয়েছি একটি স্বর শুধু

ঝরুক ঝরনার মতো— সে পুণ্য ধারায়

[মর্মর প্রাসাদ শুধু: প্রগাদ্বিমৃআ]

কবির ছোটবেলায় মুকুন্দদাসের মতো চারণকবিদের আনাগোনা ছিল ঢাকায়। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে এ কবিরা ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে সে টাকা আন্দোলনের কাজে খরচ করতেন। স্বদেশের গান গাইতেন। সেই চারণকবিরা যেন কবির মনের বেদনা বয়ে বেড়াচ্ছেন কালো কাপড় পরে। কবি তাই বলেছেন। গায়ক-বাদকের দল তার শোক প্রকাশ করতে গিয়ে যে হারমোনিয়াম ব্যবহার করেছেন, কবির অন্তর্গত শোকের ভারে সে হারমোনিয়ামটাই শোকাতুর হয়ে পড়ে।

পথে মেলি কালো বস্ত্র ‘ভিক্ষা দাও পুরবাসী’ বলে

শহরে উঠুক বেজে শোকাতুর হারমোনিয়াম।

[আসুন আমরা আজ: দুমু]

ব্রিটিশ যুগের অবসানের পরে পাকিস্তানি যুগে ঢাকা নতুন করে রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে, তবে তা প্রাদেশিক। তবু জনসংখ্যার ভারবহনে পূর্ববঙ্গের এ শহরটিই ছিল প্রধান। তাই নতুন করে গড়ে ওঠা মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী এ শহরকে ঘিরেই স্বপ্ন দেখতে থাকে। স্বাধীনতা আর দেশ-বিভাগ এদেশে সমার্থক। দেশ-বিভাগের কারণে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জেগে ওঠার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। মুসলমানদের তাড়া-খাওয়া, সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিষ্ঠালাভে আগ্রহী হিন্দুরা দ্রুত স্বদেশ ছেড়ে চলে যান। অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে ভিটেমাটিহারা বিহারি এবং অন্যজাতির মুসলমানরা হিন্দুদের তাড়া খেয়ে এদেশে চলে আসে। নতুন শহরটি ভরে যায় উদ্বাস্তুতে। স্থানীয় জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত নবাগতদের চাপে ঢাকা জনাকীর্ণ হতে থাকে। দ্রুত বদলে যেতে থাকে। তলে তলে ঢাকা একটি জাতীয় শহর হয়ে ওঠার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। বাড়তি জনসংখ্যার চাপে বাড়তে থাকে বাড়িঘর, অফিস-আদালত, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে বস্তি এবং বস্তিবাসীদের নতুন নতুন পেশা। মুঘলযুগের যানবাহন ছিল ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ি, ব্রিটিশযুগে ট্রেন এবং মুড়ির টিন নামে কাঠবডির মোটর গাড়ি। পাকিস্তানি যুগে আসতে থাকে বাস, ট্যাক্সি, রিক্সা, বেবি স্কুটার ইত্যাদি। এসব যানবাহনের চালকেরা আজ পর্যন্ত বস্তিবাসী। এমনই একজন স্কুটারচালকের কথা লিখেছেন শামসুর রাহমান।

সমাহার এ জীবন। কখনো বিবির পান-রাঙা

ঠোঁট রক্তে জাগায় বলক, ছোট্ট মেয়েটার হাসি

আমার ক্লান্তির কালি করে সাফ, দোস্তের দরাজ

দিল বুকে কেমন ভরসা দেয়, ফিল্মি গান গাই।

[স্কুটার ড্রাইভার:দুমু]

নবাবদের হাতে বেড়ে ওঠা ঢাকা শহরে ব্রিটিশযুগে সিনেমা হল গড়ে ওঠে। খাজা আজমল নামের এক নবাবজাদা প্রথমে এখানে সিনেমা বানানোর চেষ্টা করেন। সেটা নির্বাক যুগের সিনেমা। পাকিস্তানিযুগে শিল্প-কারখানা বাড়তে থাকে। আর শ্রমিকদের জন্য গড়ে উঠতে থাকে বস্তি। তাদের বিনোদনের জন্য সিনেমা হল। অবশ্য তখন ঢাকার সামন্তসমাজ ভেঙে যাচ্ছে। নবাবরা ফতুর হয়ে যাচ্ছেন। খান্দানি বাঈজিবাড়ির স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় সিনেমা হল বা প্রেক্ষাগৃহ। সেখানে তখন শ্রেণীভেদে টিকেটের দাম অনুসারে খান্দানি থেকে শুরু করে ড্রাইভার বা কুলি-কামিনরাও যাওয়ার সুযোগ পেতে থাকে। অভিজাতরা হল থেকে ফিরত পর্দাটানা ঘোড়ারগাড়িতে চড়ে, আর নিম্ন পেশার লোকেরা সদ্য দেখা সিনেমার গান ঠোঁটে নিয়ে গাইতে গাইতে ফিরত। ঢাকার সে ঐতিহ্য শামসুর রাহমান ধারণ করেছেন এখানে।

ইহুদিটা শহরের বাড়িগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছে উড়ে,

থলি কাঁধে, জীর্ণ টুপি নড়ছে মাথায়। কোনোমতে

কাকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে

কেউবা ছিঁড়ছে রুটি, ক’দিনের বাসি, নড়বড়ে

পাঁচিলের ধার ঘেঁষে। কাকগুলি পাখা ঝাপটায়

নগরের সুবিশাল নীলপক্ষ ঘড়ির আয়নায়।

[কবিতার অন্তপুরে: বি.নী.]

ঢাকার ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির বসবাসের তথ্য পাওয়া যায়। তবে সেখানে শেক্সপীয়ারের ‘মার্চেন্ট অভ ভেনিসে’র শাইলকের মতো অর্থলগ্নিকারী ইহুদিদের কথা খুব একটা পাওয়া যায় না। এখানে কাবুলিওয়ালাদের উত্পাত ছিল, ইহুদিদের কথা অজ্ঞাত। শামসুর রাহমানের কবিতায় তার ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায় সেই ইহুদিদের কথা। এ কবিতার এ দৃশ্যটি যেন ইতিহাসবিদদের অগোচরে পড়ে থাকা ঐতিহ্যের জানান দিচ্ছে।

কবির শৈশবের ঢাকা আজকের ঢাকার আধুনিক নাগরিকের কাছে রূপকথার মতো। এখানে ছিল নানা পেশার লোক, সে সব পেশা আজ কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। যেমন একটি পেশা ছিল বাতিওলা। উনিশ শতকের শেষের দিকে ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম ঢাকায় স্ট্রিটলাইটের ব্যবস্থা করা হয়। গ্যাসে জ্বলত সে সব বাতি। একজন বাতিওলা মই কাঁধে নিয়ে এসে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে যেতেন। পরদিন ভোরে এসে আবার নিভিয়ে দিতেন। এই বাতিওলা শামসুর রাহমানের কাছে নানা অর্থ নিয়ে বিভিন্ন কবিতায় উপস্থিত হন। আলো জ্বালানোর পেশাটা অনেক সময়ই আক্ষরিক অর্থ ছাড়িয়ে বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে।

সর্বাঙ্গে আঁঁধার মেখে কী করছ এখানে খোকন?

চিবুক ঠেকিয়ে হাতে, দৃষ্টি মেলে দূরে প্রতিক্ষণ

কী ভাবছ ব’সে?

[শৈশবের বাতিঅলা আমাকে: বি.নী]

কবির করোটিতে হতাশার অন্ধকারেও যেন বাতিওলা মই হাতে এসে আলো জ্বেলে দিয়ে যাবে। কিশোরসুলভ আবেগে, বেদনায় কেঁপে কেঁপে ওঠা নিজের শৈশবে সেই বাতিওলা এসে সান্ত্তনা দিয়ে যান, কুশল জিজ্ঞাসা করেন। এমনই আরেকটা পেশা— সহিস। এটাও আজকের পুরনো ঢাকার পেশা। ঢাকায় মুঘলরা ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করত। তাদের পরে নবাব এবং ইংরেজরাও ঘোড়দৌড় চালু রেখেছিল। এটা ঢাকার প্রতিষ্ঠিত এবং সুপরিচিত ঐতিহ্য। রেসকোর্সের মাঠ নামটি ব্রিটিশ আমলে হলেও শাহবাগ অঞ্চলটি মুঘল আমলেই এ কাজে ব্যবহূত হয়েছে। সহিস পেশাটি নিম্নআয়ের। একজন সহিসের ছেলের চোখেও থাকে স্বপ্ন, থাকে আশা আর থাকে স্বপ্নময়তা। সে কথাটাই কবি নিজের মতো করে তুলে ধরেছেন।

“জকির শার্টের মতো একদা ছিল দিন একদা আমারও,

রেসের মাঠের সব কারচুপি নখের আয়নায়

সর্বদা বেড়াত ভেসে। প্রতিদিন গলির দোকানে

ইয়ার বন্ধুর সাথে চায়ের অভ্যস্ত পেয়ালায়

দিয়েছি চুমুক সুখে।

[জনৈক সহিসের ছেলে বলছে: বি.নী]

মুঘল ঢাকায় আজকের পাঞ্জাব-লাহোরের মতো ঘুড়ি উড়ানোর বিরাট উত্সব হতো। সে ঐতিহ্য কয়েক শতাব্দী ধরে টিকে থাকে। শামসুর রাহমান কৈশোরে ঘুড়ি উড়িয়েছেন কিনা জানা যায় না। তবে চোখের সামনে দেখা সে বর্ণিল ঘুড়ির উত্সব কবির কাছে নানা রঙে, নানা মাত্রায় প্রকাশিত হয়। ঘুড়ির সঙ্গে অনিবার্য অনুষঙ্গ ছাদ এবং গলি। কবি স্বাভাবিকভাবেই ছাদ, গলি, শৈশবের স্মৃতি, বংশাবলির যৌথস্মৃতির পরাবাস্তবতা সব কিছু তুলে ধরেছেন।

বালকের চোখ নাক কান মুখ ঘন চুল থেকে বেরোয় কেবলি

সাতটি রঙের ঘুড়ি অবিরত— চমকিত ছাদ, বিকেলের গলি—

বংশাবলির স্মৃতির ভিতরকার স্মৃতিগুলি যেন ভাসমান।

রাঙা আসমান।

[তার ঘুড়ি: শূ.তু.শো.]

কবির শৈশবের আরেকটি চিত্র প্রকাশ করে নিচের উদ্ধৃতিটি। এখানে বানরনাচ দেখানো ঢোলা কোর্তা পরা জাদুকরের কথা বলা হয়েছে। এ লোকটিও কবির স্বপ্নের ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

সুদূর আমার ছেলেবেলার ম্যাজিকঅলা ফুল্ল ঢোলা

কোর্তাপরা বানর হয়ে

ডুগডুগিটা বাজায় হেসে।

[তোমার স্মৃতি: এ.ধ.অ.]

এ যেন গুপী-বাঘার প্রত্যক্ষ সাক্ষাত্। শিশুর চোখে বিস্ময় নিয়ে কবি এ ম্যাজিশিয়ানদের দেখেছেন। মুগ্ধ হয়েছেন। শৈশবে ঢাকার আরেকটি ঐতিহ্য ছিল সার্কাসের দল। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সার্কাসে পার্টি আসত। সার্কাস দেখাত। সার্কাসের কথাও তিনি কবিতায় নানাভাবে তুলে ধরেছেন। সার্কাসের দলগুলোর জন্য অপেক্ষা করেতন।

শহরে সার্কাসের পার্টি এলো বহুদিন পর

[কোনো কোনো কবিতার শিরোনাম: নি.বা.]

কিন্তু কালের পরিক্রমায় একদিন বয়স্ক কবি সেই শৈশবের ছেলেবেলাকেই আধুনিক ঢাকার নাগরিক ব্যস্ততার কারণে দূরে সরিয়ে রাখেন। স্মৃতি রোমন্থনকে সময় নষ্ট বলে মনে হয়। এটাই নাগরিক ঐতিহ্যের ধারাাবাহিকতা। তার বিখ্যাত কবিতাটির প্রথম কয়েকটি লাইন,

বাচ্চু তুমি, বাচ্চু তুই, চলে যাও, চলে যাও সেখানে

ছেচল্লিশ মাহুত্টুলীর খোলা ছাদে। আমি ব্যস্ত, বড় ব্যস্ত,

এখন তোমার সঙ্গে, তোর সঙ্গে বাক্যালাপ করার মতন

একটুও সময় নেই। কেন তুই মিছেমিছি এখানে দাঁড়িয়ে

কষ্ট পাবি বল?

[দুঃসময়ের মুখোমুখি: দু.মু.]

ঢাকার আরেকটি ঐতিহ্য উর্দুভাষীদের কাওয়ালি। সমবেত কণ্ঠে গাওয়া এ গানের সুর কবির কানে খুবই চেনা। তাই মাছির গুঞ্জনকেও মনে হয়েছে কাওয়ালি। অন্য কোনও কবি এ অনুষঙ্গটি ব্যবহার করলে বিষয়টা বিদ্রুপ হয়ে উঠত, কিন্তু শামসুর রাহমানের কান পুরনো ঢাকায় বড় হয়েছে। কাওয়ালি শোনা তার অভ্যাসগত বিষয়। আর কবিতায় যে তিনজন প্রবীণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তারাও পুরনো ঢাকার বাসিন্দা। শামসুর রাহমানের বিভিন্ন কবিতায় যে সব চরিত্র পাওয়া যায়, তাদের চরিত্র, শ্রেণী, পেশা এবং রুচি অনুসারে চিত্রকল্প, অনুষঙ্গ এবং ভাষা ব্যবহার করতে দেখা যায়।

ভন ভন

ওড়ে মাছি নাকের ডগায়, বুঝি ওরা এককাট্টা

গাইছে কাওয়ালি। নাড়ে, ওরা মাথা নাড়ে আর ঠাট্টা

মস্করা কথার ফাঁকে ফাঁকে চলে।

[তিনজন বুড়ো: নি.বা.]

মহরম ঢাকার একটি ঐতিহ্যবাহী উত্সব। আগেই বলা হয়েছে এটি মুঘলযুগে চালু হয়েছে। এ উত্সবের কিছু নির্দিষ্ট প্রতীক থাকে, আচার থাকে। শামসুর রাহমান বিভিন্ন কবিতায় সে সব প্রতীক নানা অনুষঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এ কবিতায় মহরমের নিশান ব্যবহার করা হয়েছে। মহরমের উত্সবের পরে ইমাম হোসেনের রক্তমাখা লাল পতাকাটি নীরবে পড়ে থাকার একটি উপমা হয়ে একটি ব্যর্থ হাতকে উপমিত করছে। এ লাল পতাকাটি সাম্যবাদের লাল পতাকার ইঙ্গিত দিচ্ছে। কবিতাটি তো মে দিবস নিয়েই লেখা।

হাত তার যেন কোণে পড়ে থাকা

মহরমের নিশান কোনো।

[মে দিনের কবিতা: ক.স.গে.]

ঢাকার কথা বলতে গেলে যাদের নাম অনিবার্যভাবেই উঠে আসে তারা ঢাকার নবাব। যদিও এ নবাবদের নেতিবাচক ভূমিকা আমাদের কষ্ট দেয়। ইতিহাসের কয়েকটি বাঁকে। এর মধ্যে একটি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ। ঢাকার নবাবরা বিদ্রোহী সৈনিকদের ধরে ইংরেজদের হাতে তুলে দিলে ইংরেজ শাসকরা সৈনিকদেরকে বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্কে তত্কালীন আংটাঘর এলাকায় আমগাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে হত্যা করে। লাশগুলো ফাঁসিতে ঝুলিয়েই রাখে ঢাকাবাসীকে ভয় দেখানোর জন্য, সেখানেই পচে-গলে। ১৯০৬ সালে নবাব সলিমুল্লাহ মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা ভেবে একটি দল গঠন করে— যার নাম মুসলিম লীগ। পরে তা সাম্প্রদায়িক দল বলে পরিচিত হয়। এসব সত্ত্বেও ঢাকার নবাবদের অবদান স্বীকার করতেই হবে। অস্বীকার করলে ঢাকার আর কিছুই থাকবে না। ইতিহাসের তিক্ত পেয়ালার পানি দিয়েই ঢাকা নামের শহরটির ইট-সুড়কি জোড়া লাগানো হয়েছে। তাই তাদের অস্বীকার করেননি শামসুর রাহমানও। তিনি তার ভাইকে নবাবদের উপমায় উপমিত করেছেন।

আমার প্রথম ভাই কান্তিমান, স্কুল-ছুট, সতত বালক

(এমনকি মধ্য বয়সেও)

নবাববাড়ীর নওশা। আলাভোলা।

[ভ্রাতৃসংঘ: ই.আ.]

আরেক কবিতায় নবাবদের দেখেছেন একটু ভিন্নভাবে অনেকটা সহানুভূতি মেশানো দৃষ্টিতে। সামন্তবাদের অবক্ষয়ের যুগে পতিত নবাবদের অসহায় দৃষ্টিটাই কবির চোখে বড় হয়ে উঠেছে।

সর্বস্বান্ত নবাবের মতো চেয়ে থাকে সূর্যাস্তের দিকে বড়

উদাসীন, গলির দোকান থেকে সিগারেট কেনে ধারে

[কবির অশ্রুর চেয়ে দামি: ই.আ.]

নদীমাতৃক এদেশের শহরগুলো কোনও না কোনও নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। যদিও আজকের ঢাকা চারটি নদী চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে। শামসুর রাহমানের তারুণ্যে বা কৈশোরে ঢাকা ছিল অনেকগুলো নদীর তীরে গড়ে ওঠা শহর। এখানে নড়াই, দোলাইসহ অনেকগুলো নদী ছিল, বয়ে চলত শহরের ভেতর দিয়ে। চারটি নদী দ্বারা বেষ্টিত হলেও ঢাকার সঙ্গে বুড়িগঙ্গা নদীর নাম একাকার হয়ে আছে। এটাই ইতিহাস। এ বুড়িগঙ্গায় পলাশির যুদ্ধে পরাজিত মুর্শিদাবাদের নবাব-পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যদের ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা-বিপণী-বিতান, কেল্লা-কাটারা ইত্যাদি স্থাপনা সবই ঐতিহ্য। তাই কবির কাছে বুড়িগঙ্গা তার কাছে স্বপ্নসৌধ হয়ে ওঠে। নদীর নিসর্গচিত্র অভিজাত মর্যাদা লাভ করে কবির চোখে।

মধ্যরাতে বুড়িগঙ্গা নদীটির বুকে

জলজ প্রাসাদ জাগে

[পারিপার্শ্বিকের আড়ালে: শূ.তু.শো.]

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী কিছু খাবার আছে। এখন যে গুলোকে বলা হয় পুরনো ঢাকার আইটেম। বাঙালি আসলে উত্সবপ্রিয় জাতি। নানা উত্সবে নানারকম খাবারের আয়োজন করে তারা। যেমন এখন পয়লা বৈশাখ মানে পান্তা-ইলিশ, আগে ছিল পয়লা বৈশাখের মুড়ি-মুড়কি- মোয়া ইত্যাদি। জ্যৈষ্ঠ মানে ফলের সমাহার। জামাই ষষ্ঠীও এক ধরনের খাবার-উত্সব। রোজার ঈদ মানে সেমাই। কুরবানির ঈদ মানে পোলাও- কোর্মা, মাংস-খিচুড়ি। রাসুলের জন্মদিন ঈদে মিলাদুন্নবি এখন বিরিয়ানি-উত্সব। শবে বরাত মূলত ইবাদতের রাত, কিন্তু বাঙালির কাছে হালুয়া-রুটির উত্সব। ঢাকার বাইরে গ্রামে চই-রুটি। মহরম মূলত শোকের দিন। নবিবংশ ধ্বংসের আয়োজন ছিল এ দিনে। ইমাম হোসেনকে কারবালা প্রান্তরে অসহায় এবং পিপাসার্ত অবস্থায় হত্যা করা হয়। এদিনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিয়া উপ-সম্প্রদায়ের লোকেরা ‘হায় হোসেন!’ ‘হায় হোসেন!’ বলে আহাজারি বা মাতম করে। মর্শিয়া গায়। বুকের রক্ত দিয়ে রাজপথ রাঙা করে। বাংলাদেশেও হায় হোসেন বলে তাজিয়া মিছিল হয়। কিন্তু অন্য দেশের লোকদের মতো শোক প্রকাশ পায় না। এ দিনেও সারাদেশে খিচুড়ির আয়োজন করা হয়। পথে-ঘাটে ডেক বসিয়ে চাঁদা তুলে খিচুড়ি রান্না করে ঘরে ঘরে, দোকানে-বাজারে সবখানে বিতরণ করা হয়। এ গুলোর মধ্যে ঢাকায় সবগুলো উত্সব হয়ে থাকে। শামসুর রাহমানের কবিতায় তা উঠে আসে। আবার উত্সব ছাড়াও স্থানীয় ঐতিহ্য হিসেবে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের খাবার। এর মধ্যে একটি বাকেরখানি। এটি একান্তই ঢাকার। শামসুর রাহমান বাকেরখানির ঘ্রাণ অস্বীকার করতে পারেন না।

বাকেরখানির ঘ্রাণ

ভেসে আসে কোত্থেকে

[আজকাল খুব বেলা করে: আ.কো.তা.নে.]

আগেই বলা হয়েছে ঢাকা নগরী এখন বলা যায় একধর্মের অধিবাসীদের। অন্যেরা এখানে সংখ্যালঘু। মুসলমানদের হাতে গড়া এবং বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভেতর দিয়ে টিকে আছে বলে এখানে শুধু মুসলমানরাই পরিপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতির এ নগরীর অধিবাসীদের প্রায় সবাই মুসলমান বলেই একে মসজিদের শহর বলা হয়। পাঁচ ওয়াক্ত আজান হয়। মুসল্লিরা নামাজে যায়। আবার কাজে ফিরে আসে। কিন্তু ভোরের আজান একটু ব্যতিক্রম। কবি সে আজানে মুগ্ধ হন বলে জানান।

ভোরের আজান কী মায়া ছড়ায় ফাঁকা রাস্তায়

ঘুমন্ত ঘরে, বিবশ কানে।

[মধ্যজীবনের বৃত্তান্ত: আ.কো.তা.নে.]

মধ্যযুগ থেকেই ঢাকায় বিভিন্ন ধর্মের লোকের বসতি ছিল। বিভিন্ন জাতিরও অবস্থান ছিল এখানে। আর্মেনিয়া নামে দেশটির সঙ্গে বর্তমানে বাংলাদেশের কূটনৈতিক কিংবা বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই বললেই চলে। কিন্তু মধ্যযুগে ঢাকায় তাদের বসবাস ছিল। ব্যবসা ছিল। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের এ লোকগুলো তেজগাঁর পর্তুগিজদের সঙ্গে হয়তো দূরত্ব বজায় রেখে চলত। তাই তারা নিজেরা এখানে গির্জা প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। সেই গির্জাটি ঢাকার একান্ত ঐতিহ্য। আর্মেনিয়ান গির্জা। নিকটবর্তী মাঠটা আজও আরমানিটোলা মাঠ বলে সুপরিচিত। এ গির্জার কাছে কাটে কবির শৈশব-কৈশোর। সে স্মৃতিও তিনি তুলে ধরেছেন পরম মমতায়।

বয়স দাঁড়িয়ে থাকে বালকের মতো

আলোজ্বলা গলির ভেতরে,

কখনো আর্মেনিয়ান গির্জের সমীপবর্তী মাঠে

বৃষ্টিভেজা কিশোরের ভঙ্গিমায়,

[আমার বয়স আমি: শূ.তু.শো.]

দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় চেনাজানা ঢাকা নিয়ে শামসুর রাহমানের নিজস্ব একটা মূল্যায়ন আছে। সে মূল্যায়নে আবেগ নেই। কাব্যিক উচ্চারণ আছে। গবেষকের মতো তথ্য-উপাত্ত দিয়ে গড়া সন্দর্ভও নয়। নগরবিশারদ নন শামসুর রাহমান। যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শুধু মন্তব্য করে গেছেন। শব্দরাজি দিয়ে গড়ে তুলেছেন কবিতার পংক্তি।

এখন আমার মাথার ভেতর সুকণ্ঠ কোনো পাখির মতো গান

গাইছে এই শহর। লোকগীতির এই শহর, ডিসকো

নাচের শহর, দোয়া-দরুদ আর মোনাজাতের শহর, ভিখারির শহর,

বেশ্যা দালালের শহর, রাশি-রাশি মিথ্যা বাগানের

শহর, ক্রুশবিদ্ধ সত্যের শহর, বিক্ষোভ মিছিলের শহর,

স্লোগান ঝংকৃত শহর, কবির মৌচাকের মতো শহর,

শেষ রাত্রির বাইজীর মতো এই শহর। এই মুহূর্তে আমি

যা স্পর্শ করব তা উন্মোচিত হবে নতুন তাত্পর্য নিয়ে।

[হোমারের স্বপ্নময় হাত: হো.স্ব.হা.]

ঢাকার বর্ণনা দিয়ে আরেকটি কবিতা আছে তার। সেখানেও প্রায় একই ধরনের উক্তি শোনা যায় কবির কণ্ঠে। অকপটে তিনি অতি আপন শহরটির ভেতরে ও বাইরের নানা অশোভন দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন।

এ শহর ট্যুরিস্টের কাছে পাতে শীর্ণ হাত যখন তখন,

এ শহর তালিমারা জামা পরে নগ্ন হাঁটে, খোঁড়ায় ভীষণ।

এ শহর রেস খেলে, তাড়ি গেলে হাঁড়ি হাঁড়ি, ছায়ার গহ্বরে

পা মেলে রগড় করে আত্মার উকুন বাছে, ঝাড়ে ছারপোকা।

[এ শহর : নি.বা.]

ঢাকা নিয়ে এমন মন্তব্য বা মূল্যায়ন করলেও ঢাকাই তার আপন শহর। এখানেই তার জন্ম এবং মৃত্যু। এ শহরের বাইরে কোথাও তিনি স্থায়ীভাবে থাকেন নি। সুখে-দুঃখে এটাই তার আশ্রয়। এ শহরে একজন কবি মারা গেলে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে কেমন প্রভাব পড়ে তা তিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন একজন বিদেশি কবির মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে। এ ঢাকায় কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন, সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো বড় লেখক সাহিত্যিকের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মৃত্যু ঘটনা নিয়ে তিনি এমন কিছু লেখেননি। কিন্তু ইউরোপের কোনও এক শহরে মারা গেলেন কবি ডব্লিউএইচ অডেন। শামসুর রাহমান যেন তা ঢাকার পটভূমিতেই অতি আপনজনের মৃত্যুর ঘটনা হিসেবে অবলোকন করেছেন, ঠিক সেভাবেই তিনি বর্ণনা দিয়েছেন। মনে হয় যেন বুড়িগঙ্গার তীরের এই ঢাকা শহরেই অডেন মারা গেলেন।

একজন কবির প্রয়াণে শহরের পথঘাট গমগম

করে না মিছিলে— সে সংবাদ কেউ কেউ শোনে কম

বেশি; কারো শ্রুতির আড়ালে থেকে যায়। গাছপালা

স্তব্ধ হয়, ফুরায় ফুলের আয়ু আর নদীনালা

কালো মেঘ রাখে বুকে, পাখিরা মর্শিয়া করে পাঠ

আর কতিপয় শব্দ- প্রেমিকের প্রাণের কপাট

খুব হুহু খুলে যায়, হূদয়ের গুল্মলতা

অলৌকিক শিশিরে শিশিরে ভিজে ওঠে সান্দ্র ব্যথা

ব্যক্তিগত বাজে, ওরা অলক্ষ্যেই করে মাল্যদান।

একজন অডেন দেখুন কী প্রচ্ছন্ন মারা যান।

[একজন কবির প্রয়াণ: এ.ধ.অ.]

বাংলার চল্লিশের দশকের রাজনীতির অন্যতম প্রধান উপাদান দেশ-বিভাগ। সময়টা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব। ভারত ছাড় আন্দোলন। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এর পরে দেশভাগ। তার পরে আবার দাঙ্গা। দেশত্যাগ। রাষ্ট্রভাষা নিয়ে অনিশ্চয়তা। সংগ্রাম। ভাষা আন্দোলন। এ সময়টা ঢাকা শহরের জন্য পরীক্ষামূলক। কারণ দেশ ভাগ হলে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে ঢাকা নতুন করে রাজধানীর মর্যাদা পেতে পারে। না হলে দিল্লির অধীনে এবং প্রাদেশিক রাজধানী কলকাতার অনুগামী হয়ে থাকতে হবে। তাই ঢাকার মুসলমানরা মুসলিম লীগকেই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে। যত সহজে কথাগুলো বলা যায়, ব্যাপারটা আসলে তত সহজ ছিল না। শামসুর রাহমানের নিজস্ব উপলব্ধি দেখতে পারি আমরা।

যৌবন দুর্ভিক্ষ- বিদ্ধ, দাঙ্গাহাঙ্গামায় ভাঙে দেশ,

এদিকে নেতার কণ্ঠে নির্ভেজাল স্বদেশী আকুতি

ভাষা খোঁজে। আদর্শের ভরাডুবি, মহাযুদ্ধ শেষ,

মঞ্চ তৈরি; কে হবে নায়ক তবে? করি কার স্তুতি?

[আত্মজৈবনিক: বি.নী.]

আত্মজীবনীমূলক এ কবিতা থেকেই বোঝা যায় শামসুর রাহমান কোনও নির্দিষ্ট মতাদর্শে অন্ধ ছিলেন না। চল্লিশের দশকের এ সময়টা ১৯২৯ সালে জন্মগ্রহণকারী কবির জন্য কৈশোর এবং উঠতি তরুণকাল। এ সময় কানে কত মন্ত্রণা আসে। তিনি কোনও মন্ত্রণা কানে তোলেন নি। এক দিকে ঢাকার উঠতি মুসলমান ব্যবসায়ী, শেরওয়ানি পরা চৌধুরী পিতা মোখলেসুর রহমান-এর নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব। এদিক থেকে মুসলিম লীগের সমর্থক হওয়া তার জন্য আশ্চর্যের ছিল না। কিন্তু কবির বাবা ফজলুল হকের ‘কৃষক প্রজা পার্টি’ করতেন, এ দলের প্রার্থিতা নিয়ে নির্বাচনও করেছেন। এ দশকে অনেক নেতাই মুসলিম লীগ করেছেন, পাকিস্তান আন্দোলন করেছেন। পরে ভোল পাল্টে পাকিস্তানকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে ছিল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রবল স্রোত। ঢাকায় অবশ্য কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা কম ছিল। এ দুই মেরু থেকে সমদূরত্বে অবস্থান ছিল সুকান্ত-সোমেন এবং কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত -সরদার ফজলুল করিমদের সাম্যবাদী ধারা। প্রগতিশীল হিসেবে রুশ বিপ্লবের অনুরাগী হয়ে এ ধারাটিও শামসুর রাহমান আঁঁকড়ে ধরতে পারতেন। কিন্তু তিনি কোনোটাই ধারণ করেন নি। উদ্ধৃতির শেষ লাইনেই আছে তার সংশয়বাদিতা। রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি এমন উঠতি বয়সে সংশয় থাকার কথা নয়। বরং তুখোড় ভক্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানেই শামসুর রাহমানের ব্যতিক্রমী অবস্থান।

শামসুর রাহমান ঢাকার ইতিহাসের উপাদান যেমন তার কবিতায় ঐতিহ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তেমনি সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানও ব্যবহার করেছেন। আগে আমরা বস্তুসংস্কৃতির নানারূপ দেখেছি। যেমন, ঢাকায় ব্যবহূত বিভিন্ন খেলনা, স্থাপনা, ঘরোয়া আসবাব, তৈজসপত্র, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। আবার দেখেছি অবস্তু সংস্কৃতির নিদর্শনও। যেমন, নানা উত্সব, আচার, অনুষ্ঠান, আচরণ, ভাষারূপ ইত্যাদি। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রাণির কথাও তিনি লিখেছেন। এর মধ্যে ঘোড়ার বিচিত্র ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। ঢাকার পথের কুকুরের কথাও তিনি লিখেছেন। বিড়ালের মধ্যে তার কবিতায় শিয়ামিজ বিড়ালের কথা বার বার আসে। পোষা পাখির কথাও তিনি লিখেছেন অনেক। সার্কাসের বিভিন্ন প্রাণির কথাও আসে। বাংলাদেশে গাধার ব্যবহার কম হলেও বিচিত্র জাতির বাসভূম ঢাকায় একদা এ প্রাণিটিরও বহুল ব্যবহার ছিল। তিনি গাধা নিয়েও কবিতা লিখেছেন।

একটি গাধাকে আমি প্রতিদিন দেখি আশেপাশে,

শহরে নিঃসঙ্গ ভিড়ে,

আমার সান্নিধ্যে দেখি রোজ

আওলাদ হোসেন লেনের মোড়ে, বাবুর বাজারে,

ইসলামপুরে, বঙ্গবন্ধু এ্যাভেন্যুর ফুটপাথে,

সাত রওজায়, সিদ্ধেশ্বরী,

পলাশী, বেইলি রোডে, বুড়িগঙ্গা নদীটির তীরে

মিটফোর্ড হাসপাতালের কাছে, ধানম্লি লেকের ওপারে।

[একটি গাধাকে দেখি: ই.আ.]

এখানে দেখা যাচ্ছে গাধাটি সাধারণ অর্থ ছেড়ে বিশেষ অর্থগ্রহণ করছে। আর সে কবির বাসস্থান সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন ছেড়ে ধীরে ধীরে নতুন ঢাকার দিকে, উত্তর ঢাকার দিকে চলে যাচ্ছে। এ গাধা কি কবির আত্মপ্রতিকৃতি নয়? এ কি উর্দু সাহিত্যিক কৃষণ চন্দরের আত্মচরিতমূলক গাধার প্রতিচ্ছায়া নয়!

**লোকঐতিহ্য:**

নগরে জন্ম এবং মৃত্যু হলেও শামসুর রাহমান অনেক গ্রামীণ এবং লোকঐতিহ্য ব্যবহার করেছেন। তবে তাকে নাগরিক বলে স্বীকৃতি দিয়ে এবং আধুনিক ভাবতে গিয়ে লোক ঐতিহ্যের অনুষঙ্গগুলো অনেক সময় উদারভাবে মেনে নেওয়া যায় না; কৃত্রিম মনে হয়। কিন্তু এটাও জানার বিষয় যে, এসব বিষয়ে কবির অনুভূতি কেমন ছিল। তিনি কি এমনিতেই ব্যবহার করেছেন এসব অনুষঙ্গ? তিনি গ্রামপ্রধান এই বাংলাদেশের গ্রামগুলো ভালোভাবে চিনতেন না? এও কি সম্ভব? তা ছাড়া ঢাকা কি একেবারেই আধুনিক হয়ে উঠেছে বা কবির জীবনকাল জুড়ে ছিল। লোকঐতিহ্য কি নগরজীবনে স্থান পায় না? তিনি গ্রামের একটি সাধারণ একটি দৃশ্যের বর্ণনা করেও লোকজীবনের দৃশ্য তুলে আনতে পারেন, যাতে আছে সাপের অনুষঙ্গ, শিউলিগাছের কথা।

ভোর- ছোঁওয়া সেই শিউলিতলায় হঠাত্ একটা সাপ দেখে তুমি চমকে উঠেছিলে, দাঁড়িয়েছিলে অনেকক্ষণ।

[কিশোররূপে একজন কবির প্রতিকৃতি:নি.দি.]

গ্রামীণ জনপদে একটি উপসম্প্রদায় বা ক্ষুদ্রজাতিসত্তা বেদে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, পেশা ইত্যাদি তাদের অন্যদের থেকে পৃথক করেছে। এটা একান্তই লোকজীবনের উদাহরণ। বেদেদের নিয়ে এদেশে অনেক কাহিনি-কিংবদন্তী, কথা-উপকথা, প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত আছে। পল্লীকবি জসীমউদ্দীন বেদেদের নিয়ে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচনা করেছেন। যাত্রাপালা, নাটক, সিনেমায়ও বেদেদের নিয়ে অনেক ঘটনা-কাহিনি প্রচলিত আছে। বেদেনীর উপস্থাপনা শামসুর রাহমানের কবিতায় আসলে লোকঐতিহ্যেরই অংশ। তাকে নাগরিক কবি বলা হলেও তিনি বেদেদের উপেক্ষা করতে পারেন না। নিচের উদ্ধৃতিতে তারই উল্লেখ।

একজন তন্বী বেদেনী বহ্নির মতো কিছু তীব্রতা ছড়িয়ে চ’লে গেলো [কিশোররূপে একজন কবির প্রতিকৃতি:নি.দি.]

বেদেনীদের নিয়ে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতাই লিখেছেন। সেখান থেকেও দুটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যায়। যেখানে একটি কাহিনি আছে, শেষে একটি প্রশ্নও আছে।

তন্বী বেদেনী বউটি তোমার হারাল কোথায়?

কোথায় উজাড় করলে তোমার ভরা ঝাঁপি?

[ বেদেনীর জন্যে: ধূ.গ.শি.]

ভেলা, বেহুলা, লখিন্দর, হেন্তালের লাঠি, চাঁদ সদাগর ইত্যাদি মনসামঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ হলেও বাঙালির লোকজীবনে, বিশেষ করে বাংলাদেশের নদী-নালা-খাল-বিল-ডোবা-পুকুর-দিঘির পানিতে সাপের উপস্থিতি এসব কথা ও কাহিনি জনমানসে বিশেষ প্রভাব ফেলে। কবি সেখান থেকে নানা অনুষঙ্গ তার কবিতায় ব্যবহার করেছেন। যেমন,

[ক] ভেলায় ভাসছে কত গলিত বেহুলা চতুর্দিকে।

[না আমি উন্মাদ নই; দু.মু.]

[খ] বেয়নেটবিদ্ধ লাশ বুড়িগঙ্গা কি শীতলক্ষ্যায় ভাসে;

মনে হয়, স্বাধীনতা লখিন্দর যেন,

বেহুলাবিহীন,

জলেরই ভেলায় ভাসমান।

[স্বাধীনতা একটি বিদ্রোহী কবিতার মতো: দু.মু.]

[গ] হায় যদি পারতাম হতে

লাশবাহী বেহুলার ভেলার বেহুলা!

...

বয়সকে বড় বেশি ঘেন্না করি

যেমন বিক্ষুব্ধ চাঁদ সদাগর মনসাকে।

[এক মহিলার ভাবনা;দু.মু.]

[ঘ] যতদিন হিন্তাল কাঠের

লাঠি আছে হাতে, আছে

ধমনীতে পৌরুষের কিছু তেজ, যতদিন ঠোঁটে

আমার মুহূর্তগুলি ঈষত্ স্পন্দিত হবে, চোখে

নিমেষে উঠবে ভেসে কোনো শোভাযাত্রার মশাল,

করব না আন্ধারের বশ্যতা স্বীকার ততদিন,

যতই দেখাক ভয় একশীর্ষ, বহুশীর্ষ নাগ,

ভিটায় গজাক পরগাছা বারংবার, পুনরায়

ডিঙ্গার বহর ডোবে ডুবুক ডহরে শতবার,

গাঙ্গুড়ের জলে ফের যাক ভেসে লক্ষ লখিন্দর।

[চাঁদ সদাগর: উ.উ.পি.চ.স্ব]

উদ্ধৃতিগুলোর প্রথমটিতে দেখা যায়, কবি তার পরিবেশে অনেক বেহুলাকে দেখতে পাচ্ছেন। যারা স্বামীর গলিত শব নিয়ে বসে আছে। একটা উত্কট পরিবেশ-বর্ণনার জন্যই এই অনুষঙ্গের ব্যবহার। দ্বিতীয়টিতেও একই ধরনের অনুভূতি প্রকাশের জন্য লখিন্দরের অনুষঙ্গ। তিনি স্বাধীনতাকে লখিন্দরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পচে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে, কিন্তু মাটিতে মিশে যায় না। ভেলায় চড়ে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু সে ভেলায় বেহুলা নেই। এখানে লখিন্দরকে একা দেখানো হয়েছে। লখিন্দরকে উেপ্রক্ষা হিসেবে ব্যবহার করে আগের মতোই একটা বীভত্স পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন। তবে ভেতরে পার্থক্য আছে। এখানে আছে গতি। তৃতীয় উদ্ধৃতিতেও একই ধরনের বীভত্স রস ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে কবি ঘেন্না শব্দটি ব্যবহার করে তা স্পষ্ট করেছেন। তবে এখানে আছে তুলনামূলক পরিস্থিতি বর্ণনা। বার্ধক্যকে কবি ঘৃণা করেন বলে বার্ধক্যের চেয়ে সহনশীল মনে হয়ে তার কাছে বেহুলাজীবন। ভেলায় স্বামীর শব থাকলেও, মরা, পচা, গলা হলেও সেখানে আত্মার বন্ধন আছে। একটা আশা আছে। কারণ একদিন লখিন্দর পুনরুজ্জীবন লাভ করবেই— এমন প্রত্যাশা থেকে বেহুলার ভেলাযাত্রা। পক্ষান্তরে বার্ধক্যে কোনও আশা থাকে না। তাই কবি মনে করেন জঞ্জালপূর্ণ যৌবনের বেগ বার্ধক্য থেকে অনেক ভালো। তাই তার এমন স্বীকারোক্তি। সব শেষের উদ্ধৃতিটি চাঁদ সদাগরকে নিয়ে লেখা একটি দীর্ঘ কবিতা থেকে নেওয়া। সেখানে তিনি চাঁদের আত্মমর্যাদাকে একজন আত্মসচেতন আধুনিক মানুষের মর্যাদার প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। কবি নিজে দীর্ঘ জীবনে চাঁদ সদাগরের মতো অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি আত্মবিক্রয় করেন নি।

দেশ স্বাধীনতার আগে, বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদানেরও দুই দিন আগে জাতীয় শহিদ মিনারে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে ড. আহমদ শরীফের নেতৃত্বে শামসুর রাহমানসহ অনেক কবি-সাহিত্যিক স্বাধিকার রক্ষার জন্য শপথ নেন। কবি হাসান হাফিজুর রহমানকে আহ্বায়ক করে ‘লেখক সংগ্রাম শিবির’ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি সেখানেও ছিলেন। যদিও তিনি পাকিস্তান সরকারের পত্রিকায় চাকরি করেছেন একাত্তরের ষোলো ডিসেম্বর পর্যন্ত। তবে তখন তিনি ছদ্মনামে স্বাধীনতার পক্ষে লেখালেখি করে গেছেন। স্বাধীনতার পরে ‘দৈনিক বাংলা’য় চাকরি করার সময়ে বাকশাল প্রতিষ্ঠিত হলে অনেক কবি-সাহিত্যিক পদ-পদকের লোভে একদলীয় শাসনব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়ে সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন। শামসুর রাহমান লোভনীয় অফার পেয়েছেন, আবার চাপও সহ্য করেছেন কিন্তু অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন নি। পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক সরকারগুলো যত অন্যায় আর অবিচার করেছে, রাষ্ট্র পরিচালনায় যত অমানবিক আইন প্রণয়ন করেছে, সবগুলোতেই তিনি প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তখন দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই সামরিক সরকারদের কাছে ভিড়ে অনেক সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন। তিনি ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। জঙ্গিবাদ, মৌলবাদবিরোধী কর্মকা্লে সর্বদাই তিনি থেকেছেন অত্যন্ত দৃঢ়। তার এই উদ্ধতশিরের প্রতীক হয়ে আছে চাঁদ সদাগরের অনুষঙ্গ।

লক্ষ্মী গ্রামবাংলার একটি জনপ্রিয় অনুষঙ্গ। হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে লক্ষ্মী পূজনীয় দেবী হলেও মুসলমানদের অনেকেই ‘লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী’ তে আস্থা রাখেন। শুভ-অশুভের প্রতিশব্দ হিসেবেও এ শব্দদুটি ব্যবহার করে থাকেন। দৈবী ধারণা একটি বিশেষ ধর্মের নিজস্ব বিষয় হলেও লোকধারণা বাঙালি মাত্রেরই। একইভাবে সরস্বতীর ধারণাটিও অনেক মুসলমান ব্যবহার করে থাকেন। এটি সবাই হয়তো বিশ্বাস করেন না, তবে প্রচলিত কথা হিসেবে বলে থাকেন। বিদ্যার দেবী সরস্বতীকে অর্চনা দিলে সচ্ছলতার দেবী লক্ষ্মী তাকে এড়িয়ে চলেন। এ কথাটিই কবি এখানে তুলে ধরেছেন।

যার ডাকে

সংসার কুটোর মতো ভাসে; বীণাপাণি তার বাহুলগ্না থাকে

দেখে লক্ষ্মীঠাকরুণ দুয়ার থেকেই ফিরে যান।

[তার চোখে আমি:এ.ধ.অ.]

বাংলার সহজ মানুষের সন্ধানী বাউল সম্প্রদায়ের প্রতি শামসুর রাহমানের আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অনেক সময় তাদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতেন। বাউল সাধক লালনের নাম, একতারা, দোতারা কিংবা অন্য বাউলপন্থী শব্দ সহযোগে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। এবং কবিতায় উল্লখ করেছেন। যেমন,

[ক] তোমার গহন চোখে চোখ পড়তেই একজন

বাউল আমার বুকে পদযাত্রা করলেন শুরু

আমার গলায় তার একতারা গভীর দোলালো ছায়া

[ কেন যে আমার এই ঘরে: এ.ধ.অ.]

[খ] সে গানের ধ্বনি স্তব্ধ সায়রে

ফোটায় নিবিড় অজস্র শতদল।

ধুলোয় উধাও সে গানের কলি

গ্রামছাড়া পথে, মনের মানুষের খোঁজে।

[লালনের গান: রৌ.ক.]

[গ] হে রাখাল, হে দোতারা তোমাদের কাছ থেকে দূরে

কখনো পারিনি যেতে। আলুথালু পরাণ বধূরে

ফেলে রেখে গ্রহকোণে বিরান কোথাও দরবেশী

আস্তানায় কম্বলে ঢাকিনি দেহ কিংবা পরদেশী

হইনি কড়ির লোভে।

[গ্রামীণ: রৌ.ক.]

[ঘ] প্রতিদিন উচ্চাকাঙ্ক্ষী আমার দোতারা

বাজাবে আলাদা সুর,

[অনেকদিন থেকেই:ধূ.গ.শি.]

[ঙ] বাউলের

একতারা স্বপ্ন দ্যাখে নিরালা শিয়রে

[পারিপার্শ্বিকের আড়ালে: শূ.তু.শো]

প্রথম উদ্ধৃতিতে শামসুর রাহমান জানান, তার মনে বাউল উদাস ভাব চলে আসে। দ্বিতীয়টিতে তিনি লালনের গানে তন্ময়তা নেমে আসার, মুগ্ধতার কথা বলেন। যে গানের কলি গ্রামের পথে মিশে থাকে, মিশে থাকে সহজ মানুষের সঙ্গে। এর পরেরটিতে দেখি, তিনি দোতারাকে জানাচ্ছেন যে তিনি কখনো বাউলদের থেকে মানসিক দূরত্বে অবস্থান করেননি। তিনি বাউল, কিংবা বাংলার রাখালদের থেকে সরে গিয়ে কোথাও গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নেননি। তিনি ঝামেলাপূর্ণ সংসার ছেড়ে দরবেশ ধারণ করেননি। কবিতাটির নামেই বোঝা যায়, কবি গ্রামীণ জীবনকে অস্বীকার করতে পারছেন না। যদিও তিনি গ্রামে খুব ঘনিষ্ঠভাবে থাকেননি। কিন্তু তাদের পর ভেবে সরে থাকেননি। চতুর্থ উদ্ধৃতিটিতে দেখি, কবি দোতারা হাতে নিলেও সেখানে তিনি নিজস্বতা হারাতে চান না। এখানে তিনি একটু পৃথক। দোতারাকে বলছেন ‘উচ্চাকাঙ্ক্ষী’। আর চিরচেনা বাউলদের সুর থেকে নিজের সুর ভিন্নরূপে আবিষ্কার করে নিয়েছেন বলে ভিন্নসুর বাজানোর কথা বলছেন। সব শেষেরটিতে সরাসরি বাউলের একতারার কথা বলেছেন, যা শিয়রে নিরালা স্বপ্ন দেখে। আমাদের দেশে সাধারণত একতারা ব্যবহার করে বাউলেরা, আর দোতারা ব্যবহার করে বয়াতিরা। তাদের মধ্যে তরিকা বা মত-পথ ও আদর্শগত পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু এদেশের সবাই বাউল ও বয়াতিদের একদৃষ্টিতেই দেখে। কবিও এর ব্যতিক্রম নন।

গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লোককথা, কাহিনি ইত্যাদি বর্ণনামূলক ঐতিহ্য। সেখান থেকেও শামসুর রাহমান অনেক উপাদান নিয়েছেন। ব্যবহার করেছেন সরাসরি বাস্তবতার খাতিরে, কখনো পরাবাস্তবতা প্রকাশের জন্য। আবার কখনও অলংকার হিসেবে। যেমন,

সাত সফরে এই জীবনের সত্যসার

সিন্দাবাদের নখমুকুরে বিম্বিত।

সোনার কাঠি রুপোর কাঠি চিহ্নিত

ঘুমের খাটে শঙ্খমালা ঘুমন্ত;

কৌটো খোলা ভোমরা মরে জীবন্তু।

[হাতির শুঁড়: রৌ.ক.]

এখানে আরবের রূপকথা সিন্দবাদকে আধুনিক মানুষের জীবনের নানা উত্থান-পতনের রূপকে দেখানো হয়েছে। সাত অভিযান তাই বলে। সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি, শঙ্খমালা, কৌটোর ভোমরা সুয়ো-দুয়োরানির রূপকথা থেকে নেওয়া বাঙালির শাশ্বতজীবনের নানা পর্যায়েরই টীকাভাষ্য হয়ে আছে।

সন্ধ্যার খালুই থেকে লাফিয়ে উঠেছে চাঁদ দূরে

বহুদূরে, ঘাটে বাঁধা তন্বী নাও, একটি কি দুটি

নয়, কয়েকটি, নিচ্ছে বিশ্রাম এখন, মেঠো সুরে

মাঝি পড়ে সায়ফুল মুলুকের পুঁথি, লুটোপুটি

খায় নানারঙা মাছ পানির ভেতরে মাঝে-মাঝে,

যেন দ্যায় সায় ত্রিপদীতে। আমানি নকশি-কাঁথা

দ্যাখে মাঝি পাঠ সেরে।

[সন্ধ্যার খালুই থেকে: উ.উ.পি.চ.স্ব]

এখানে গ্রামের একটি নিত্যদিনের দৃশ্য এঁকে কবি দেখাতে চেয়েছেন সেখানে হাজার বছরের বাঙালির নানা ঐতিহ্য, উপাদান মিশে থাকে আমাদের জীবনে, সংস্কৃতিতে। মেঠোসুর, সায়ফুলমুলুকের পুঁথি, নাও, নকশিকাঁথা ইত্যাদি অবস্তু এবং বস্তুসংষ্কৃতির অনিবার্য অনুষঙ্গ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলা কবিতায় নৌকোর অনেক প্রতিশব্দ ব্যবহূত হয়। নৌকা, তরী, তরণী ইত্যাদি। কিন্তু ‘নাও’ শব্দটি একটু ভিন্ন দ্যোতনা দেয়। এটি আমাদের রূপকথা, লোককাহিনি, কিংবদন্তী, ঐতিহ্য ইত্যাদির ধারণা জাগায়। ‘সোনার নাও পবনের বৈঠা’ বলে যে কথাটি প্রচলিত আছে সেখানে নৌকা বা তরী বা অন্য কোনও শব্দ ব্যবহার করলে মূলসুর হারিয়ে ফেলবে। শামসুর রাহমানও সে ব্যাপারে সচেতন ছিলেন বলে নাও শব্দটি এখানে ব্যবহার করেছন।

অখ্যাত স্টেশনে নেমে খানিক জিরিয়ে

হেঁটে যাবে, তারপর উঠবে নৌকায়, পালে হাওয়া

লাগবে, মেঘনার বুক চিরে,

যাবে তুমি বহুদূরে ভাটিয়ালি টানে।

...

পড়বে কি মনে পূর্ণিমায় পুরনো পুকুর পাড়ে ঢ্যাঙা নাঙা

ফকিরের নিসর্গ-মাতানো নাচ? মধ্যরাতে বৈঠকখানায়

মাইজভা্লারি গান?

[নস্টালজিয়া: হো.স্ব.হা]

স্মৃতিরোমন্থনে কবি গ্রামবাংলার নিসর্গচিত্রে সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ তুলে ধরেছেন। নৌকা, পাল, মেঘনার বুক এর সঙ্গে ভাটিয়ালি গান অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর পরে আরও আছে লোকনৃত্য ফকিরের নাচ। বাংলাদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় বা উপসম্প্রদায়ের ফকিরেরা একতারা, দোতারা বা কৃষ্ণকাঠি বাজিয়ে নেচে গেয়ে আধ্যাত্মিক সাধনার আচার পালন করে থাকে। দর্শক- শ্রোতার মনোরঞ্জনও করে থাকে। বিভিন্ন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। রাত জেগে লোকে সে সব দেখে, শোনে। আরও আছে বৈঠকখানায় রাত জেগে শোনা মাইজভা্লারির গান। মরমী এ গানের ধারাও শামসুর রাহমানের স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল। নিচের আরেকটি উদ্ধৃতিতে দেখি চারণকবির মেঠো গাথার সঙ্গে মুয়াজ্জিনের আজানের মিশ্রণ। উপস্থপনাটি সুন্দর।

তোমার পাখায় ছিল নীলমণির মতো আকাশের

নিঃসীম উল্লাস, চারণ কবির

মেঠো গাথার মতো বন্দনা-মুখর সহজ সৌন্দর্য,

আর মুয়াজ্জিনের আজানের মতো অনাবিল আহ্বান।

[আমার অভিযোগের তর্জনী;ধূ.গ.শি]

গ্রামের প্রবীণ মানুষের মুখে শোনা নানা কথা-উপকথা-রূপকথাও শামসুর রাহমান গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন। কবিতায় তা যথাযথভাতে উপস্থাপন করেছেন। কোথাও আরোপিত মনে হয় না। কারণ বাংলার একান্ত নিজস্ব বিষয় একজন বাঙালি কবি হিসেবে বেশ সাধারণভাবেই তুলে ধরছেন। কোথাও কৃত্রিমতা নেই। কবির জীবনে পুকুর একটি অবিচ্ছেদ্য উপকরণ। তার নিজের গ্রামের বাড়ি পাড়াতলীতে পিতৃপুরুষের কাটা পুকুর, পাড়ের মসজিদ ইত্যাদি বার বার তিনি উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন কবিতায়। সে পুকুরের পাড়ে বসে তিনি স্বাধীনতাবিষয়ক অমর কবিতাগুলো রচনা করেছেন। এ পুকুর ডুবে কবির কিশোর ছেলে মারা গেছে। গ্রামে গেলে সে পুকুরপাড়ে বসে গাজীকালু চম্পাবতীর পুঁথি শুনতেন— যা একদিন কালের ধুলোয় হারিয়ে যায়, তিনি চেষ্টা করেছেন সে দৃশ্য আর সুরটি ধরে রাখতে।

সে-কথা প্রথম শুনি গাঁওবুড়াদের

মুখে; তাঁরা গোধূলিতে পুকুরের পাড়ে বসে প্রবীণ গলায়

গাজীকালু চম্পাবতী পুঁথি সুরের

আমেজ মিশিয়ে বলেছিলেন সে-কথা মনে পড়ে।

[গাঁওবুড়াদের মুখে: ধূ.গ.শি.]

বাঙালির লোকচিকিত্সার একটা পদ্ধতি ঝাঁড়-ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র। পৃথিবীর অনেক দেশেই তা প্রচলিত আছে। তবে আধুনিক কবি এসব থেকে দূরে সরে থেকেছেন। লোক-সংস্কারকে কুসংস্কার গণ্য করেই এড়িয়ে গেছেন। তন্ত্রমন্ত্রকে অশুভবিদ্যা হিসেবে বিবেচনা করে শিক্ষিত লোকেরা। ধার্মিকেরাও। তাই কবি স্বীকারেক্তিতে বলছেন সে কথা। যদিও একজন বাঙালি হিসেবে বারোমাসে তেরো পার্বণে অভ্যস্ত; কিন্তু তন্ত্রসাধনায় সায় দেন নি। ঘরোয়া জীবনের অভ্যস্ততাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। শেষ পংক্তিতে বোঝা যাচ্ছে এক প্রকার সংশয়বাদিতাই এর মূলে রয়েছে। পরের উদ্ধৃতিতে অবিশ্বাস স্পষ্ট। ঝাঁড়ফুঁক দিয়ে পৃথিবীর অসুখ বিসুখ দূর করা যাবে না। আমাদের পৃথিবীর অসুখ বিসুখ নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। এখানে পুরো মানব সভ্যতার অসহায়ত্বের দিকটি দেখানো হয়েছে।

[ক] ভদ্রমহোদয়গণ! বারো মাস তের পার্বণ-কাতর

লাজুক আত্মাকে বসতিতে যথাযথ

রাখার প্রয়াসে নিত্য উচাটন আমরা কখনো

গুহাকে করিনি ঘর, রাখিনি পানীয় করোটিতে,

আঁঁকিনি স্বর্গের নকশা বাঘছালে, তুকতাক মন্ত্রের প্রাচীন

কোনো পুঁথি ছিল না সম্মুখে খোলা সর্বক্ষণ। হলদে

পুঁথির তুলোট পাতা আকাঙ্ক্ষার শবটাকে কখনো পারে কি

দিতে চাপা? একদিন লক্ষ্যে পীেঁছে যাব নিরাপদে

আমরা তেমন কেউ নই; দূরে ও নিকটে

প্রকৃতই লক্ষ্য কিছু আছে কিনা সেও তো জানি না।

[সম্পাদক সমীপেষু: বি.নী.]

[খ] পৃথিবীকে বদলাতে পারি না আমরা, পারব না

ওষুধবিষুধ দিয়ে কিংবা ঝাড়ফুঁকে পৃথিবীর

শুশ্রূষা করতে।

[বন্ধুদের প্রতি: বি.নী.]

লোকঐতিহ্যের অনন্য উপাদান বস্তুসংস্কৃতি। শামসুর রাহমান নাগরিক ঐতিহ্যের দৃষ্টান্ত যেমন দেখাতে পারেন, তেমনি লোকজীবনের ঐতিহ্যও তুলে ধরতে পারেন। অনেক কবিতায় তিনি সে সব ব্যবহার করেছেন। নিচের উদ্ধৃতিতে দেখি কয়েকটি উপাদান, খেলনা, কাঠের ঘোড়া, পুতুল, সপ্তডিঙা ইত্যাদি। এগুলো আমাদের উত্সবের কথা মনে করিয়ে দেয়, বাঙালির হাজার বছরের আবহমান উত্সব এবং কর্মকা্লগুলো চোখের সামনে জীবন্ত করে তোলে পুতুলের বিয়ে, তেপান্তরে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ানো, সমুদ্রে সপ্তডিঙা ভাসানোর ঐতিহ্য ইত্যাদি।

আমার মেয়েকে দেখি বাড়িটার আনাচে কানাচে

বেড়ায় আপন মনে, ফ্রক-পরা। লেখাঘরে তার

রকমারি খেলনা নিয়ে সকাল-বিকাল মেতে আছে।

দেখি রোজ ঘটা করে পুতুলের বিয়ে দেয় আর

ছোটায় কাঠের ঘোড়া তেপান্তরে, সমুদ্রে ভাসায়

সপ্তডিঙা।

[খেলনা: বি.নী.]

কবি ট্রেনের জানালা দিয়ে যা দেখেন তাতে লোকজীবনের অনেকখানি উঠে আসে। কিছুটা খালি চোখে কিছুটা অতীতের স্মৃতিসঞ্চয় থেকে। আর অনেকখানি ঐতিহ্যের চর্চায়। এখানে আমরা পাই ইঁদারা, নিকানো উঠোন, দিঘি, বাসন-কোসন, শিকা, গুড়, খয়েরি বৈয়ম, অতিথির পাত এবং মাটির কলস। এগুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে অতিথি পরায়ণতা, ধান ভানার দৃশ্যসহ সংসারের শতকাজ। কবির এ দৃশ্যটি জাতির প্রতিনিধিত্বকারী কবিতার অংশ। এখানেই আছে আবহমান বাংলা। এখানে উত্সব নেই আছে নিত্যদিনের চিত্র।

হয়তো কেউ ডেকে নিয়ে গেছে নিকানো উঠোনে,

ধান ভানা বাকি আছে, আছে ইঁদারার কাছে যাওয়া, বাসী কিছু বাসন- কোসন

সাজিয়ে রাখতে হবে। শিকায় ঝোলানো

খয়েরি বৈয়ম থেকে গুড় এখুনি নামিয়ে দিতে হবে

অতিথির পাতে, সে এখন মিশে যাবে সংসারের

শত কাজে, যেমন দিঘির সুনসান

পানিতে সহজে ভেসে যায়

মাটির কলস।

[ট্রেনের জানালা থেকে:ধূ.গ.শি.]

পল্লীকবি জসীমউদদীনের সাহিত্যের প্রধান উপাদান পল্লীজীবন ও সংস্কৃতি। বাংলা সাহিত্যে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায় এবং বন্দে আলী মিয়া প্রমুখ পল্লীকবি খ্যাতি পেয়ে আসছেন। কিন্তু এদের মধ্যে যথার্থ পল্লীকবি বলা যায় একমাত্র জসীমউদ্দীকে। অন্যেরা যেখানে শুধু নিসর্গদৃশ্য রচনা করেছেন সেখানে জসীমউদ্দীন গ্রামীণ জীবনের দশদিকই তুলে ধরেছেন। প্রকৃতি, সংস্কৃতি সবকিছু তুলে ধরেছেন তিনি। এ ছাড়া গ্রামীণ জীবনের মূলধারার জনগোষ্ঠীর বাইরে বেদে সম্প্রদায় ইত্যাদি দিকও তুলেছেন। তাকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছেন শামসুর রাহমান সেখানে প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গক্রমে লোকঐতিহ্যের কিছু উপাদানও তুলে ধরেছেন।

করোটিতে ছিল তাঁর কী ব্যাপক চর-থরথর

কাইজার চিত্রনাট্য, গাথার ছন্দের মতো সোনার গতর

গ্রাম্য যুবতীর, মাছলোভী মাছরাঙা, সারিগান।

স্বপ্ন-কণা-ধান

ঝরেছে করোটি জুড়ে,

[বার্ধক্যে জসীমউদ্দীন: হো.স্ব.হা]

বাঙালি লোকজীবনে শাশ্বত প্রেমের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত রাধা-কৃষ্ণ। এটা শুধু বাঙালি নয়, পুরো উপমহাদেশ জুড়েই রাধা-কৃষ্ণের জয়জয়কার। হাজার হাজার গান, কবিতা রচিত হয়েছে ভারতবর্ষের প্রায় সবকটি ভাষায়। বাংলায় কৃষ্ণের অনেকগুলো নাম। কানু, কানাই, শ্যাম, কালিয়া, কালা, কেষ্ট ইত্যাদি। শামসুর রাহমান কালিয়া নাম ধরেও উল্লেখ করেছেন। আবার চ্লীদাস ও রজকিনী প্লেটনিক বা নিষ্কাম প্রেমের অপূর্ব উদাহরণ হিসেবে অমর হয়ে আছে। কবি এটিও উল্লখ করেছেন। নিচের উদ্ধৃতি দুটিতে দেখা যাক। প্রথমটিতেই রজকিনীর কথা। কবি রজকিনীর কামগন্ধহীন প্রেমে বিশ্বাস করেন না। তাই অসম্ভাব্যতার প্রতীক হিসেবে তিনি ডুমুরের ফুলের অনুষঙ্গটি টেনে এনেছেন। দ্বিতীয়টিতে অন্ধকারের নাম দিয়েছেন ‘কালিয়া আধাঁর।’ রাত যেমন প্রেম ও কামের উপকরণ, তেমনি রাত অন্ধকারের রূপধারী কৃষ্ণ। শেষেরটিতে রাধা-কৃষ্ণ বা চ্লীদাস-রজকিনীকে নিয়ে লেখা বৈষ্ণব পদাবলিকে আধুনিক যুগের জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকরণের সামনে উপমা হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে।

[ক] কৃপাপ্রার্থী নয় কারো, তবু বিশ্বাসঘাতকতার চুমো নিয়ে

গালে গূঢ় ডুমুরের ফুলের নিকট

কামগন্ধহীন রজকিনী প্রেম চায়।

[একটি গাধাকে দেখি: বা.স্ব.দ্যা.]

[খ] কালিয়া আঁঁধার কনক চাঁপার

শরণ নিত যে তাও আজ মনে পড়ে!

[মিশ্ররাগ: বি.নী]

[গ] আমার বয়স জন্মশাসনের বিজ্ঞাপনগুলিকে নিমেষে

বানায় বৈষ্ণব পদাবলি।

[আমার বয়স আমি: বা.স্ব.দ্যা.]

শামসুর রাহমান ভেলা শুধু মনসার ভাসান হিসেবে ব্যবহার করেননি। আধুনিক জীবনে ভেলা একটি অস্থিরতার প্রতীক। সে হিসেবেও তিনি লিখেছেন ‘ভেলায়’ নামের কবিতাটি। সেখানে পারিপার্শ্বিক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও ভঙ্গুরতার প্রতীক হিসেবে ভেলা এবং ভেলায় ভাসমান জীবনের দৃশ্য এঁকেছেন।

সাগরে যাচ্ছি ভেসে বুড়োটে ভেলায় চেপে।

কবে যে পালের ফালি নিমেষে উধাও হল,

জানি না হঠাত্ কবে ছিঁড়েছে দাঁড়ের দড়ি।

[ ভেলায়:বি.নী.]

লোকজীবনের নানা প্রবাদ-প্রবচনও শামসুর রাহমান তার কবিতায় তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে একটি উদাহরণ; এখানে ‘হাঁড়ির খবর,’ ‘ভিটায় ঘুঘু চড়ানো,’ ‘বেজায় দড়’ প্রভৃতি বাগধারা ব্যবহার করেছেন কবি।

অগ্রগামী দেবতাদের হাঁড়ির খবর জানা আছে;

যখন খুশি পরের ভিটায় ঘুঘু চড়াও, এমনি আরও

কা্লে তোমরা বেজায় দড় জানা আছে।

[হাঁটতে হাঁটতে শেষ অবধি:বা.স্ব.দ্যা.]

হাস্যরস সৃষ্টিতে কবি কৃত্তিবাস ও তাঁর রামায়ণ জয়ন্ত মণ্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ,

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সাধারণত আমরা জানি যে, অসঙ্গতি জনিত কারণেই হাসির উদ্রেক হয়ে থাকে। আবার সেই হাসির মধ্যে যদি সাহিত্যের রস মিশ্রিত থাকে তাহলে সেই হাসি থেকেই হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। প্রকৃত হাস্যরস হল কাউকে কোন রকম আঘাত না করে নির্মল ভাবে হাস্য উপভোগ করা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস বলতে যা বোঝায় তাকে ইংরেজিতে humour না বলে satire বলা যায়, যার বাংলা অর্থ হল শ্লেষাত্মক। বাঙালির প্রকৃতি একদিকে যেমন ছিল গীতপ্রাণ এবং কল্পনা প্রবন, তেমনি অন্যদিকে ছিল দৈনন্দিন জীবন রসের রসিক। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে রাজসভার প্রভাব, কবির ব্যক্তি স্বভাব এবং পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণের ফলে কবি কৃত্তিবাস তাঁর রামায়নে হাস্যরস সৃষ্টিতে এক অভিনব মাত্রা প্রদান করেছেন। কবি ভারতচন্দ্রের হাস্যরসের মাত্রা অনেক সময় বাঙালির রুচিবোধকে কোন কোন দিক থেকে আঘাত করলেও কৃত্তিবাসের হাস্যরস সৃষ্টিতে বাঙালির রুচিবোধকে আঘাত করেনি। কবি কৃত্তিবাস হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাঙালির মনন ও রুচির দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। সব থেকে বড় কথা সেই সময় বাঙালি সমাজ শিক্ষাভিমানী বা রুচিবাগিশ ছিল না। এর ফলে সেই সময়ের গ্রাম্য, স্থূল বা শ্লেষাত্মক হাসি উপভোগেও কোন বাধা ছিল না। কিন্তু কৃত্তিবাসের ক্ষেত্রে আরও একটু অন্যভাবে বলা প্রয়োজন। কেননা কবি কৃত্তিবাস বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন। এই গ্রন্থের আকার এত বড় যে, এই গ্রন্থ পড়তে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। আবার এই দীর্ঘ রচনার মধ্যে যদি হাস্যরস না থাকে তাহলে পাঠকের মনে একঘেয়েমি ভাব চলে আসবে। যেহেতু জন সাধারণের কল্যান ও মনোরঞ্জন করাই ছিল কবির প্রধান উদ্দেশ্য, ফলে তিনি তাঁর রামায়ণের অনেক স্থানেই অনায়াসে কোথাও বাকচাতুর্য, কোথাও রঙ্গব্যঙ্গ আবার কোথাও কৌতুক বা স্থূল ভাঁড়ামির মাধ্যমে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন।

কবি কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন তার সূত্রপাত আদিকাণ্ড থেকেই শুরু হয়েছে। আদিকাণ্ডে দেখা যায় মিথিলায় বিশ্বামিত্র মুনি যজ্ঞের আয়োজন করলেও রাক্ষসগণের অত্যাচারে যজ্ঞ পূর্ণ করতে পারছে না। এই যজ্ঞকে পরিপূর্ণ করার জন্য বিশ্বামিত্র মুনি রাম লক্ষণকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। বিশ্বামিত্র মুনি এই দুই ভাইকে সঙ্গে করে নিয়ে তাড়কা রাক্ষসীর বনে প্রবেশ করে। বিশ্বামিত্র মুনি রামকে বলে এখান থেকে মিথিলায় ঘুরে গেলে তিনদিনের পথ কিন্তু যদি এই বনের ভিতর দিয়ে যাওয়া হয় তাহলে মাত্র তিন বেলার পথ। এর উত্তরে রাম বলেছে তিনদিনের পথে কেন ঘুরে যাবে, তিন বেলার পথেই তারা যাবে। প্রয়োজন হলে তাড়কা রাক্ষসীকে বধও করবে রাম। রাম যখন তাড়কার ঘর দেখতে চেয়েছে তখন বিশ্বামিত্র মুনির মধ্যে যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল তা অবশ্যই আমাদের মনের মধ্যে হাসির সৃষ্টি করে। তাড়কার ঘর দেখাতে গিয়ে বিশ্বামিত্র মুনির মনে যে ভয় জেগেছিল তাকে বোঝানর জন্য কবি কৃত্তিবাস লিখেছেন-

“উভয় ভ্রাতার মধ্যে থাকি মুনিবর।

দূর হৈতে দেখালেন তাড়কার ঘর।।

কর বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া।

অতি ত্রাসে মুনিবর যান পলাইয়া।।” ( আদিকাণ্ড, পৃ- ৬৪ )

রাম অযোধ্যার রাজা হবার পূর্ব মুহূর্তে পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে যায় চৌদ্দ বছরের জন্য। সঙ্গে পত্নী সীতা এবং ছোট ভাই লক্ষণ। তারা গিয়ে আশ্রয় নেন পঞ্চবটী বনে। এই পঞ্চবটী বনে চলে রাক্ষসদের রাজত্ব। রাক্ষসী সূর্পণখা এই বনে বাস করে। রামের রূপগুণ দেখে সে মুগ্ধ হয়ে রামকে বিয়ে করতে চায়। যেহেতু রামের সঙ্গে তার পত্নী বিদ্যমান তাই রাম একটু কৌতুক করতেই লক্ষণকে দেখিয়ে দেয়। এখানেও কবি হাস্যরসের সৃষ্টি করতে লিখেছেন –

“পরিহাস করেন শ্রীরাম সুচতুর।

রাক্ষসীকে বাড়াইতে বলেন মধুর।।

আমার হইলে জায়া পাবে সে সতিনী।

লক্ষনের ভার্যা হও সেও বড় গুণী।।” ( অরন্যকান্ড, পৃ- ১৫৩ )

রামের মুখের কথা শুনে এবার সূর্পণখা লক্ষনের কাছে গিয়ে আশ্রয় চায়। কিন্তু লক্ষণ যেমন সত্যবাদী চরিত্র তেমনি আবার রাগি। সূর্পণখা লক্ষণকে বার বার বিরক্ত করতে থাকলে লক্ষণ ধৈর্যের বাইরে চলে যায়। বাধ্য হয়ে রাক্ষসীর নাক ও কান কেটে দেয়। নাক ও কান কাটার অপমানের কথা দাদাকে জানাতে সে লঙ্কায় যায়। লঙ্কায় গিয়ে সূর্পণখা-

“রাবণে কহিতে যায় আত্মসমাচার।

নাক কান কাটা তার বীভৎস আকার।।

যার কাছে যায় রাঁড়ী সেই ভয় পায়।

খেয়ে খর দূষণে রাবণে খাইত যায়।।” ( অরন্যকান্ড, পৃ- ১২৭ )

সূর্পণখার এই অবস্থার জন্য পাঠকের মনে যেমন দুঃখের সঞ্চার হয় তেমনি আবার একই সঙ্গে হাসিরও উদ্রেক করে। লঙ্কার রাবণের একমাত্র বোন অথচ সে যার কাছে যায় সেই ভয়ে পালায়। কিস্কিন্ধ্যাকান্ডে দেখা যায় রাম সুগ্রীবের আশ্রয় নিয়েছে। সুগ্রীব সীতার উদ্ধার করতে রামের সাহায্য করবে নিজে এবং নিজের সমস্ত সৈন্য দিয়ে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন বালিকে বধ করা। বালি বেঁচে থাকলে সুগ্রীব কোনদিন রাজ্য ফিরে পাবে না। ফলে রাম বালিকে বধ করে সুগ্রীবকে রাজ্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। রামের প্রতিশ্রুতি পেয়ে সুগ্রীবও সীতা উদ্ধারে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। বিনা দোষে রাম বালিকে বধ করে এবং বালিকে মারার কারণ জেনে বালি রামকে বলেছে যে দায়িত্ব সুগ্রীবকে দেওা হয়েছে সেই দায়িত্ব বালিকে দিলে মুহূর্তেই সীতাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসত। কেননা বালি রাবণকে যুদ্ধে পর্রাস্ত করতে পারে। রাবণের সঙ্গে একবার বালির যুদ্ধের কথা প্রসঙ্গে বালি বলেছে-

“রাবণ আসিয়া ছিল রণ করিবারে।

লেজে বান্ধি ডুবালাম চার পারাবারে।।

লেজের বান্ধন তার কিষ্কিন্ধ্যায় খসে।

পায়ে পড়ি আমার সে উঠিল আকাশে।।” ( কিস্কিন্ধ্যাকান্ড, পৃ- ১৫৩ )

ব্রহ্মার বরে যে রাবণ ব্রহ্মাণ্ডের কাউকে ভয় করে না, সর্বত্রই তার জয় হয়েছে সেই রাবণ বালির মত বানরের লেজে বাঁধা পড়ে আছাড় খেয়েছে এই কথাটা ভাবলেই হাসির উদ্রেক হয়। আবার এই কান্ডেই দেখা যায় যে, সুগ্রীব রাণী তারাকে পেয়ে সারাক্ষণ কামে ব্যস্ত। সীতার চিন্তায় এদিকে দুই ভাই ব্যকুল হলেও সুগ্রীব তা ভুলে যায়। এদিকে লক্ষণ সুগ্রীবকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য অত্যন্ত রেগে এসেছে সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা করতে। পুত্র অঙ্গদ গিয়ে লক্ষনের আগমনের বার্তা সুগ্রীবকে দিলেও সুগ্রীবের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। রানীকে নিয়ে কামে ব্যস্ত থাকলে অন্যান্য বানরগণ লক্ষণকে দেখে ভয় পেতে থাকে। এবার বানরগণ যুক্তি করে সুগ্রীবকে বাইরে আনার জন্য চিৎকার করতে শুরু করেছে। এই অংশের বর্ণনায় কবি কৃত্তিবাস লিখেছেন-

“জাগাইতে রাজারে করিল পাঁচাপাঁচি।

অনেক বানরে মিলি করে কিচিমিচি।।

বানরের কোলাহল হইলেক দ্বারে।

কার সাধ্য স্থির থাকে সে ঘোর চিৎকার।।” ( কিস্কিন্ধ্যাকান্ড, পৃ- ১৫৯ )

কৃত্তিবাসের রামায়ণে সবথেকে বেশি হাস্যরস ফুটে উঠেছে সুন্দরাকান্ড ও লঙ্কাকান্ডের মধ্যে। এই দুই কান্ডে হাসির ঘটনা এতবেশি যে, কৃত্তিবাসকে হাস্যরস সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত কবি বলাই যেতে পারে। সুন্দরাকান্ডে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, হনূমানকে লঙ্কায় পাঠানো হয়েছে সীতার খোঁজ করার জন্য। হনূমান লঙ্কায় রাবণ পরিবারের সকলকেই দেখতে পেল কিন্তু সীতাকে খুঁজে পাচ্ছে না। এর ফলে সীতাকে খুঁজতে অনেক সময় লেগে গেল। সীতাকে না পাওয়া পর্যন্ত হনূমান লঙ্কায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়েছে তার মধ্যেও প্রচুর হাসির উপাদান ছড়িয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত অশোকবনে সীতার সঙ্গে হনূমানের সাক্ষাৎ হয়। এখানে হনূমানের চোখে পড়েছে সীতার পরিচারিকাদিগের রূপগুণ। হনূমানের দেখা রূপের বর্ণনায় কবি লিখেছেন-

“কেহ কালী কেহ গৌরী কেহ চেরী ধলী।

খর্জূর তালের মত শিরে কেশাবলী।।

আউদর চুল কারো মাথা যুড়ি নাক।

কাঁকলাস মুর্ত্তি কারো সব মাথা তাক।।” ( সুন্দরাকান্ড, পৃ- ১৯৫ )

শুধু তাই নয় , সীতার সঙ্গে হনূমানের কথোপকথন শেষ হলেই শুরু হয় হনূমানের তাণ্ডবলীলা। সীতাকে খুঁজে না পাওয়ার জন্য এতক্ষন সে কোন লীলাই দেখায়নি। রাবণ যার সাথে যুদ্ধ করতে চলেছে সেই রামের অনুচররা যুদ্ধে কতটা পটু তার নমুনা একটু না দেখালে কি চলে ? তাই হনূমান সীতার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমের বন ভাঙ্গার কাজ শুরু করে। নেউল হয়ে আম গাছে চড়লে ভয়ে সমস্ত পাখিরা উড়ে যায়। নেউলকে দেখে রাক্ষসরা ভাবে ভালোই হল, নেউল আমগাছ পাহারা দিক আর আমরা ঘুমাই। এই সুযোগে হনূমান আমগাছের সঙ্গে যেন যুদ্ধ শুরু করেছে। হনূমানের এই আমগাছ ভাঙ্গার লীলা প্রকাশ করতেই কবি লিখেছেন-

“ডাল ভাঙ্গে হনূমান শব্দ মড়মড়ি।

আতঙ্কে রাক্ষস সব উঠে দড়দড়ি।।

উঠিয়া রাক্ষসগণ চারিদিকে চায়।

অমৃতের বন দেখে কিছু নাহি আর।।” ( সুন্দরাকান্ড, পৃ- ২০১ )

এবার লঙ্কায় ধ্বনি পড়ে গেল হনূমানের তান্ডবের। বানর হয়ে লঙ্কার ক্ষতি করবে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। হনূমানকে উচিৎ শিক্ষা দিতে এবার রাবণ একের পর এক রাক্ষসকে পাঠায় হনূমানকে ধরে বন্দী করার জন্য। হনূমান অষ্টরাক্ষস ও অক্ষকুমার বধ করলে শেষে ইন্দ্রজিত আসে হনূমানকে বন্দী করতে। যেখানে রাবণের ভয়ে ত্রিভুবন কাপে সেখানে ছোট্ট একটি বানরের এমন দুঃসাহসের কথা ইন্দ্রজিত বললে তার উত্তরে হনূমান যে প্রত্যুত্তর করেছে তাতেও হাস্যরস ফুটে উঠেছে। হনূমান ইন্দ্রজিৎকে তার পিতার সম্পর্কে বলেছে-

“আপনার অনাচার না দেখ আপনি।

রাবণের অনাচার ত্রিভুবনে শুনি।।

দশহাজার স্ত্রী যদ্যপি আছে ঘরে।

তথাপি সে তোর বাপ ব্যভিচার করে।।” ( সুন্দরাকান্ড, পৃ- ২০৪ )

শুধু তাই নয় হনূমানকে বন্দী করে রাবণের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা চলছে। এমন সময় হনূমান রাবণের সৈন্যদের ডেকে বলে তাকে যেন রাজ সম্ভাষণে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হয়। হনূমান সৈন্যদের বলেছে-

“হনূমান বলে তোরা বাজা রে দামামা।

রাজ সম্ভাষণে যাব কান্ধে কর আমা।।

বড় বড় সাঙ্গি দিয়া হনূমানে বান্ধে।

দুই লক্ষ রাক্ষসে তাহারে করে কান্ধে।।

যেই ভিতে হনূমান কিছু দেয় ভর।

‘রাখ’ বলি রাক্ষস ছাড়িয়া দেয় রড়।।” ( সুন্দরাকান্ড, পৃ- ২০৪ )

সুন্দরাকান্ডের এই হাস্যরস আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যখন হনূমানকে বন্দী করে তার লেজে আগুন দেওয়া হয়েছে। হনূমান তার লেজে আগুন নিয়ে লঙ্কার একের পর এক ঘর আগুনে পোড়াতে থাকে। হনূমানকে শাস্তিস্বরূপ তার লেজে আগুন দেওয়া হলেও ফলস্বরূপ দেখা যায় যে, সেই আগুনেই গোটা লঙ্কা পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এই অংশের বর্ণনায় কবি লিখেছেন-

“অগ্নিতে পুড়ি পড়ে বড় ঘরের চাল।

কত স্ত্রী পুরুষের গায়ের গেল ছাল।।

উলঙ্গ হয়ে কেহ পলায় উভরড়ে।

লেজে জড়াইয়া ফেলে অগ্নির উপরে।।” (সুন্দরাকান্ড, পৃ- ২০৬ )

এখানে আরও হাস্যকর বিষয় হল লঙ্কায় সরোবর আছে সারি সারি। সমস্ত নারী আগুন থেকে বাঁচার জন্য সেই সরোবরে নেমে ডুব দেয়। জলে ডুব মেরে আর কতক্ষণ থাকা যায়। যখনই জলের উপরে মুখ বের করে তখনই হনূমান তাদের মুখের উপর লেজের আগুন নিয়ে যায়। এই ঘটনাটি কী আমাদের মনে হাসির সৃষ্টি করে না ? অবশ্যই করে।

সুন্দরাকাণ্ডেই দেখা যায় হনূমান সীতার খবর নিয়ে ফিরে এসেছে। এবার পালা সাগর বাঁধার। সাগর বাঁধতে না পারলে এত সৈন্য নিয়ে লঙ্কায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। এই সাগর বাঁধার সময় দেখা যায় হনূমান আর নলের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছে। কেননা হনূমানের কাজ হল পর্বত ভেঙ্গে পরিশ্রম করে বয়ে আনা, আর নল সেই পর্বতের ভাঙ্গা অংশ বা হাতে ধরে নামায়। এতে হনূমানের মনের মধ্যে রাগের দানা বাঁধে। একবার হনূমান পর্বতের একটা অংশ নিয়ে আসে এবং নলকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। ভয়ে নল নিজের জায়গা থেকে লাফিয়ে পালিয়ে এসে রামের কাছে এসে নালিশ করে। নলের উপর হনূমানের রাগের কারণ রাম জিজ্ঞাসা করলে এর উত্তরে হনূমান বলেছে-

“করি আমি প্রাণপণ আনিতে পর্বতগণ

বামহাতে নল তাহা ধরে।

এই হেতু ক্রোধ করি আনিনু অনেক গিরি

চাপা দিতে এ নল বানরে।।” ( সুন্দরাকান্ড, পৃ- ২১৮ )

হনূমানের এই কথায় স্বয়ং রাম হাসিমুখে দুজনের অভিমান ভাঙ্গিয়ে দেয়। হনূমানের স্বভাব রাম জানে। তাই দুজনের হাত একত্রিত করে দুজনের মধ্যে আবার মিত্রভাব প্রতিষ্ঠা করে। নলবীর কেন রামের কাছে অভিযোগ করেছিল সেই অংশটুকু তুলে ধরলে এখানে হাসির কারণ আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। নলের নালিশের কারণ –

“মাথায় পর্ব্বত লয়ে হনূমান দেয় বয়ে

বামহাতে ধরে বীর নল।

মহাক্রোধে হনূমান পর্ব্বত আনিতে যান

বুঝি বেটা কত ধরে বল।।

যায় বীর মনোদুঃখে চলিল উত্তর মুখে

যথা গিরি সে গন্ধমাদন।

দেখি পর্ব্বত চূড়া লাথি মারি করে গুঁড়া

লোমে লোমে করয়ে বন্ধন।।

দুই হাতে দুই গিরি লইয়া মস্তকোপরি

অমনি পবন বেগে ধায়।

ধায় বীর মহাতেজে এক গিরি বান্ধি লেজে

শূন্যে উপরি চলি যায়।।

রবির কিরন নাই অন্ধকার সর্ব্ব ঠাই

চমকিয়া চাহে বীর নল।

ক্রোধে আসে হনূমান উড়িল নলের প্রাণ

উঠিয়া পালায় মহাবল।।” (সুন্দরাকান্ড, পৃ- ২১৮ )

সুন্দরাকান্ডে দেখা যায় রামচন্দ্র সমস্ত সৈন্য নিয়ে সাগর তীরে এসে হাজির হয়েছে। তারপর সাগর বেঁধে লঙ্কায় আসে। লঙ্কায় এসে অঙ্গদকে লঙ্কায় পাঠানো হয় রামের লঙ্কায় প্রবেশের খবর দেওয়ার জন্য। অঙ্গদও হনূমানের মত লঙ্কাকান্ড ঘটিয়ে ছাড়ে। অঙ্গদ জানে হনূমান সীতার কাছ থেকে হাতের মনি এনে দিয়েছিল রামের হাতে। এর ফলে হনূমান রামের আরও প্রিয় হয়ে যায়। অঙ্গদও রামের কাছে প্রিয় হবার জন্য রাবণের মুকুট নিয়ে চলে আসে। এখানে কবি হাস্যরস সৃষ্টিতে লিখেছেন-

“রাবণেরে আছাড়িয়া বালির নন্দন।

মুকুট লইয়া বেগে উঠিল গগন।।

অঙ্গদের বিক্রমে রাবণ কাপে ডরে।

অধোমুখে উঠিয়া গায়ের ধুলা ঝাড়ে।।

.........

রাবণ বলিছে সবে আছ কোন কাজে।

বানরে মুকুট লয় সবাকার মাঝে।।” (লঙ্কাকান্ড, পৃ- ২৩৭ )

কবি কৃত্তিবাসও যে হাস্যরস সৃষ্টিতে কারোর থেকে পিছিয়ে নন তার যথাযত পরিচয় আমরা পাই লঙ্কাকান্ডে। সমগ্র লঙ্কাকান্ড জুড়েই কৃত্তিবাস হাসির জোয়ার তুলে দিয়েছেন। যে কবির মধ্যে প্রচুর পরিমানে রসবোধ থাকে একমাত্র সেই কবিই হাস্যরসের উপস্থাপনা করতে পারেন। এই দিক থেকে আমরা অবশ্যই কৃত্তিবাসের রসবোধকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আসনে স্থান করে দিতে পারি। লঙ্কাকাণ্ডে প্রথম যখন রাবণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তখন দেখা যায় হনূমানের চর খেয়ে রাবণ অচেতন হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, বানর নীল দেউল থেকে নেউলে পরিণত হয়েছে এবং সরাসরি রাবণকে আক্রমণ করেছে। নেউল হয়ে প্রথমে রাবণের রথে চড়ে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে রাবণের মাথায় গিয়ে আশ্রয় নেয় যাতে রাবণ হাত দিয়ে তাকে ধরতে না পারে। রাবণের সঙ্গে ক্ষুদ্র বীর নীলের যুদ্ধের বর্ণনায় কবি লিখেছেন-

“নীলের প্রতাপ যেন সিংহের প্রতাপ।

রাবণের মস্তকেতে করিল প্রস্রাব।।

রাবণের মুকুটেতে নীলবর মুতে।

মুখে বয়ে পড়ে মুত্র সর্ব্ব অঙ্গ তিতে।।

প্রস্রাবের ধারা বয় রাবণ অঙ্গেতে।

আভরণ কুক্মুম ভাসিয়া গেল স্রোতে।।” ( লঙ্কাকাণ্ড, পৃ- ২৫৪ )

রামচন্দ্র এবং তার সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অকালে রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণকে ঘুম থেকে জাগানো হয়। যুদ্ধে যাওয়ার আগে সে রাবণের কাছ থেকে রামচন্দ্র সম্পর্কে সমস্ত কিছু শুনে নেয়। রামের সমস্ত বর্ণনা ও কার্যাবলী শুনে কুম্ভকর্ণের মনে হয়েছে এ কোন সাধারণ মানুষ নয়। কেননা সাগর জলে যে পাথর ভাসিয়ে বাঁধ দিতে পারে সে অবশ্যই কোন ব্রহ্মচারি হবে। ভাইয়ের মুখে একথা শুনে রাবণ প্রত্যুতরে বলেছে-

“রাবণ বলিছে রাম কিসের ব্রহ্মচারী।

ভক্তিতে ডাকিলে যায় চন্ডালের বাড়ি।।

দিন পাঁচ ছয় ছিল পঞ্চবটী মূলে।

সেখানে পাকাল জটা আঠা মেখে চুলে।।” ( লঙ্কাকাণ্ড, পৃ- ২৬০ )

লঙ্কাকাণ্ডে দেখা যায় দীর্ঘ যুদ্ধের পরেও কেউ ইন্দ্রজিৎ কে পরাস্ত করতে পারছে না। যখন বিভীষণের কাছ থেকে ইন্দ্রজিৎ এর আসল মৃত্যুর ইতিহাস জানা গেল তখন হনূমান গিয়ে হাজির হল ইন্দ্রজিৎ এর যজ্ঞভঙ্গ করতে। কেননা ইন্দ্রজিৎ যদি একবার যজ্ঞ সেরে ফেলতে পারে তবে আর কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না। এই যজ্ঞ ভঙ্গ করার জন্য বানর নল-নীল এবং হনূমান যে কাণ্ড করেছে তার মধ্যেও রয়েছে প্রচুর হাসির উপকরণ যার মাধ্যমে পাঠকের মনে অনায়াসেই হাসির সৃষ্টি হয়। ইন্দজিৎ এর যজ্ঞ যেভাবে হনূমান ভঙ্গ করেছে তার বর্ণনা দিয়ে কবি লিখেছেন –

“হনূমান যেন সিংহের প্রতাপ।

যজ্ঞকুন্ড ভরি তার করিল প্রস্রাব।।

যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনূমান মুতে।

ফলফুল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় স্রোতে।।” ( লঙ্কাকাণ্ড, পৃ- ৩১১ )

রাবণ যখন দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করতে আসে তখন শক্তিশেল ব্যবহার করে। রাবণের সঙ্গে লক্ষনের যুদ্ধ শুরু হলে শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষণ অচেতন হয়ে পড়ে। এবার তাকে বাচানোর জন্য প্রয়োজন বিশল্যকরণীর পাতার রস। এই ঔষধ আছে গন্ধমাদন পর্বতে যা সূর্য উদয়ের আগেই আনতে হবে। রাবণ এই কথা জানতে পেরে সূর্যকে মধ্যরাতে উদয় হওয়ার জন্য পাঠায়। রাবণের এই ব্যবহারের মধ্যে মস্তবড় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। কেননা সূর্য নিজের নিয়মে উদয় হয় আবার অস্তও যায়। কিন্তু যেহেতু রাবনের ভয়ে সকল দেবগণ ভীত তাই রাবনের কথা অমান্য করতে পারেনি। হনূমান বিশল্যকারনী খুঁজতে গিয়ে সূর্যের দেখা পায় এবং কৌশল করে সূর্যের উদয় বন্ধ করতে হনূমান বলে-

“তব নাম ভানু হয় হনূ মম নাম।

নামে নামে মিলিয়াছে দুজনে সমান।।

খণ্ডিবে তোমার দোষ রাবণের কাছে।

সাধিব রামের কার্য যুক্তি হেন আছে।।

দুইদিক রক্ষা পাবে সুমন্ত্রণা করি।

হনূভানু দুইজনে করিব মিতালি।।” ( লঙ্কাকান্ড, পৃ- ৩২৫ )

হনূমানের মুখে এমন মিস্টি বাক্য শুনে সূর্য হনূমানের কাছে আসে হাসি মুখে সম্ভাষণ করতে। এই সুযোগে হনূমান সূর্যকে ধরে নিজের কক্ষ তলিতে চাপা দেয়। যতক্ষণ লক্ষন সুস্থ হয়ে না উঠে ততক্ষন হনূমানের হাত থেকে সূর্য মুক্তি পাবে না।

ঔদারিকতার আতিশয্য হল হাস্যরস সৃষ্টির আরও একটি সহজ উপায়। তাই লঙ্কাকান্ডের শেষে সীতা উদ্ধারের পর রামচন্দ্র স্বদেশগমন করেছে এবং ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে পরিশ্রান্ত সকল সৈন্য আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এখানে বানরদের খাদ্য গ্রহণের যে দৃশ্য কবি বর্ণনা করেছেন তাতেও হাসির রসের সৃষ্টি করেছেন। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে বানরদের ভোজন প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-

“আকণ্ঠ পুরিয়া খায় যত ধরে পেটে।

নড়িতে চড়িতে নারে পেট পাছে ফাটে।।

উর্দ্ধ দৃষ্টে রহে সবে নাহি চায় হেঁটে।

কোনরূপ চিত হয়ে শুইলেক খাটে।।” ( লঙ্কাকান্ড, পৃ- ৩৭৪ )

কৃত্তিবাসের উত্তরাকান্ডে দেখা যায় যে, পূর্বের কাণ্ডগুলোর মধ্যে যে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা নেই সেই সব বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিষ্কিন্ধ্যাকান্ডে আমরা জানতে পারি যে, বালি আর রাবণের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধের কারণ জানা যায় উত্তরাকান্ডে। এই অংশে হাসির বিষয় খুব বেশি না হলেও একেবারে নেই একথা বলা যাবে না। রাবণ ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পায় সর্বত্র জয়ী হবে। এই সাহসের উপর ভর করেই রাবণ এসে বালির কাছে যুদ্ধ চায়। রাবণ নিজে বালিকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ করলে দুজনের মধ্যে যুদ্ধ লাগে এবং বালি রাবণকে উচিৎ শিক্ষা দেয়। বালি ও রাবণের যুদ্ধের বর্ণনায় কবি লিখেছেন-

“রাবণের দুর্গতিতে দবে হাস্য করে।

পশ্চিম সাগরে বালি গেল তার পরে।।

ডুবায় বান্ধিয়া লেজে বালি লঙ্কেশ্বরে।

এত জল খাইল যে পেটে নাহি ধরে।।” ( উত্তরাকান্ড, পৃ- ৪১১ )

বালির কাছে পরাজিত হলেও যুদ্ধের সাধ রাবণের মিটে নি। বালির কাছ থেকে রেহাই পেয়ে রাবণ যায় বরুণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। বরুণের দ্বারে গিয়ে রাবণ যুদ্ধ করতে চাইলে বরুণের পাত্র বলে সে ঘরে নেই। কিন্তু ঘরে না থাকলেও অন্যত্র কোথাও তো অবশ্যই আছে। তাই রাবণ বলে যেখানে বরুণ আছে সেখানেই যুদ্ধ করবে। রাবণের অদম্য ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছেন কবি এই ভাবে-

“রাবণ বলিছে কোথা গিয়াছে বরুণ।

তথা গিয়া আজি আমি করি মহারণ।।” ( উত্তরাকান্ড, পৃ- ৪১৩ )

যে রাবণ ভূবন বিজয়ী তার সঙ্গে বালি ছাড়া আর কেউ যুদ্ধ করবে বলে মনে হয় না। রাবণের ভয়ে বরুণ লুকিয়ে আছে। কিন্তু তার পরেও রাবণের ইচ্ছা বরুণ যেখানে আছে সেখানে গিয়েই সে করবে অর্থাৎ যুদ্ধ তাকে করতেই হবে যেখানেই বরুণ পালাক না কেন।

কৃত্তিবাস কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণের হুবহু অনুবাদ করেন নি। অনেক ঘটনাবলী বাদ দিয়ে আবার অনেক কিছু সংযোজনও তিনি করেছেন। ফলে দেখা যায় যে, কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণের ঘটনাবলী এমন ভাবে সাজিয়েছেন যে, তিনি না চাইলেও হাসির উদ্রেক হবেই বলা যায়। তাছাড়া পাঠকদের বা শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করার একটা বিরাট দায়িত্ব ছিল মধ্যযুগের কবিদের উপর। কেননা তখন পাঠকের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। যে সমস্ত পাঠক ছিল তারা যাতে কাব্যপাঠ করে আনন্দ উপভোগ করতে পারে সেদিকেও কবিদের লক্ষ্য রাখতে হত। একথা ঠিক যে, কবি কৃত্তিবাস যে হাস্যরসের সঞ্চার করেছেন তা সম্পূর্ণ রূপে পাঠক উপভোগ করতে পারবে তাতে কোন বাধা নেই। একই সঙ্গে একথা বললেও অত্যুক্তিকর হবে না যে, কৃত্তিবাস রামায়ণে হাস্যরস সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১। হালদার, গোপাল, কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৭৪ ।

২। প্রামানিক, মলয়, রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত, গ্রন্থবিকাশ, ২০০৭ ।

৩। আড়ু, কেশব, কৃত্তিবাসী রামায়ণ পর্যালোচনা, প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১৫ ।

৪। ঘোষ, আশিসকুমার, অন্নদামঙ্গল কবি ও কাব্য, প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০০৪ ।

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণবুক এজেন্সি, প্রা:লি, ১৯৬৬ ।

**হাবিব তনবীর : ভারতীয় নাট্য সাহিত্যের অন্যতম অধ্যায়**

**চন্দন বারিক**

**গবেষক, বাংলা বিভাগ**

**কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়**

ভারতীয় নাট্য সাহিত্যের এক অন্যতম প্রতিভাবান ব্যক্তি হলেন হাবিব তনবীর। আসল নাম হাবিব আহমেদ খান । নাট্যকার জীবনের প্রথমের দিকে তনবীর ছদ্মনামে লিখতেন। পরে আহমেদ খানকে ছেঁটে দিয়ে তনবীর জুড়ে হবিব তনবীর হয়েযান । ১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৩ খ্রীঃ হাবিব আহমেদ খানের জন্ম। জন্মস্থান ছত্রিশগড়ের রায়পুর। কবিতা রচনার মধ্যদিয়ে সাহিত্য জগতে পদচিহ্ন রাখেন। পরে নাট্য রচনা ও অভিনয়ের মধ্যে নিজের চিন্তা চেতনার প্রকাশ মাধ্যম খুঁজে পান।

কিংবদন্তী নাট্যকার হাবিব তনবীরের সমগ্র নাট্যজীবন ও কর্মকাণ্ডের আলোচনার অবকাস ও সাধ্য আমার নেই। এই অক্ষমতা প্রথমে স্বীকার করতে বাধা নেই। এই লেখায় শুধুমাত্র তাঁর নাট্য সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য সানাক্ত করার সাথে সাথে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের কথা বলব মাত্র। হাবিব তনবীরের নাট্য সাহিত্যে একপ্রান্তে ‘আগ্রাবাজার’ অপরপ্রান্তে ‘রাজরক্ত’ অবস্থিত। ভারতীয় থিয়েটারের একটি স্পষ্ট আকৃতি তৈরী করার জন্য হাবিবজী নিজের মতো করে চেষ্টা করেগেছেন। আগ্রাবাজার থেকে রাজরক্ত –এই সুদীর্ঘ পরিক্রমায় তিনি কখনও সংস্কৃত ধ্রুপদি নাটকে হাত দিয়েছেন, আবার কখনওবা সম্পূর্ণ দেশজ উপকরণে প্রযোজিত করেছেন বিদেশি আধুনিক নাটক। এবং একটা বড় সময় জুড়ে কাজ করেছেন ভারতের নানা অঞ্চলের লোকনাটক নিয়ে। বিশেষ করে ছত্রিশগড়ের লোকনাট্যের আঙ্গিককে নিয়ে আধুনিক নাটকের মধ্যে প্রযোগ করে ভারতীয় নাট্যশীল্পকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছেন।

হাবিব তনবীরের বিখ্যাত কয়েকটি জনপ্রিয় নাটক হলো –‘আগ্রাবাজার’, ‘বাহাদুর কলারিন’, ‘শাজাপুরকি শান্তিবাঈ’,’চরনদাস চোর’, ‘গাঁওকা নাম শশুরাল’, ‘হিরমা কি অমর কাহিনী’, ‘ কেস নং ৪৩২’, ‘ মাংলু দিদি’, ‘ দেবীকা বরদান’। হাবিব তনবীর প্রণীত উর্দু নাটক আগ্রাবাজার এর প্রথম অভিনয় ১৯৫৪ সালে জামিয়া মুক্তমঞ্চে (দিল্লী)। প্রযোজক জামিয়া ড্রামা সোসাইটি , দিল্লী । নির্দেশনা হাবিব তনবীর। তনবীর সাহেব তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন –“ আগ্রাবাজার লিখতে গিয়ে আমি দিল্লীর লেখক মির্জা ফারহাতুল্লা বেগ ও ‘দিল্লী কা গালিয়ার’ লেখক আহমেদ শাহ বোখারির রচণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হই ”। ১ - এই নাটকটির মধ্যে ফুটে উঠেছে আগ্রাবাজারের খণ্ড খণ্ড চিত্র। যার ফলে নাটকটি হয়ে উঠেছে জীবন্ত। নাটকে ছিল বাটী বাজিয়ে পয়সা রোজগারের চিত্র। ফেরিওয়ালার ডাক, ঘুড়ী ওড়ানো, সাঁতার প্রতিযোগীতা, বাঁদর ও ভাল্লুকের নাচের চিত্র। এই নাটকটি প্রথমে অভিনয় করেন জামিয়ার শিক্ষক ও ছাত্ররা। দর্শকরা নাটক দেখতে এসে বাজারের সাধারণ জনসাধারণ হয়ে ওঠে ,অর্থাৎ তাঁরা এক এক জন নাটকের চরিত্র হয়েওঠেন। এছাড়া বাঁদর ও ভল্লুক মলমুত্র ত্যগকরে মঞ্চকে নোংরা করে ও গন্ধে ভরিয়ে তোলে, যার ফলে নাটকটি চূড়ান্ত বাস্তবে প্ররিণত হয়। আগ্রাবাজার নাটকের সাফল্য লাভের পর নাটক বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য হাবিব তনবীর বিদেশ যাত্রা করেন। কয়েক বছরের পর ফিরে আসেন এবং আজীবন নাটক ও অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকেন সততার সহিত।

হাবিবজীর পরের সফল নাটক হলো ‘গাঁও কা নাম শশুরাল’। ১৯৭৩ সালে রায়পুরে এক মাসব্যপি ওয়ার্কশপের ফসল হলো এই নাটক। নাট্যকার নিজেই বলেছেন–“ওয়ার্কশপে আমি তিনটি স্টক কমেডি ব্যবহার করে আমি একটি লম্বা নাটক তৈরী করি।”( আত্মজীবনী,-অঙ্কিতা ঘোষ অনুদিত)। এই কমেডি তিনটি হলো ; (১) গৌরীগৌরা নামে একটি সামাজিক আচার। এই আচারের গল্পটি ছেঁড়া ছেঁড়া । পৌষ পুর্ণিমায় ছেলেরা পূর্ণিমা পালনের জন্য বাড়ী বাড়ী চাঁদা চায় গান গেয়ে। এবং সেই চাঁদায় যে নদীতে পৌষ পূর্ণিমার অনুষ্ঠান হয় তার পাশে নিজেরা পিকনিক করে। এই কাহিনীকে নাট্যকার সামান্য পরিবর্তন করে নাটকে ব্যবহার করেন । (২) দ্বিতীয় গল্পটি হলো ‘বিরওয়া বিওয়া’ । বিরওয়া বিওয়া এক বৃদ্ধ –যে একটি তরুনীর পাণিগ্রহন করতে চায় এবং এ বিষয়ে সে মেয়ের বাবার সঙ্গে কথা বলে। মেয়ের বাবা ভাবেন বৃদ্ধ তার বাড়ীর কোন যুবকের সম্বন্ধ এনেছেন। তাই তিনি রাজি হয়ে যান। পরে যখন বৃদ্ধ বর বেশে স্বয়ং আসেন তখনতো কন্যা দায়গ্রস্থ পিতার চক্ষু চড়কগাছ। (৩) তৃতীয় গল্পটি হলো এক উপজাতির বিবাহ প্রথা নিয়ে। এই উপজাতির মেয়েরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায় এবং বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে; কিছুদিন থাকার পরে লুকিয়ে তার সবকিছু লুঠকরে পালিয়ে যায়। কিছুদিন পরে আবার বিবাহ কর, আবার পালিয়ে যায়। এই ভাবে তাদের সংসার চলে। - এই তিনটি পৃথক পৃথক কাহিনীকে তিনি সুকৌষলে যুক্ত করে ‘গাঁও কা নাম শশুরাল’ নাটকটি রচনা করেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো ,এই নাটকে অভিনেতা অভিনেত্রী হিসাবে তিনি গ্রামের সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করেন।

হাবিব তনবীরের শ্রেষ্ট নাটক “ চরণদাস চোর।” এই নাটকটিও একটি কর্মশালার ফসল। ভিলাইতে ১৯৭৪ সালে কর্মশালা চলাকালীন নাট্যকার বেশ কয়েকটি ছোটো ছোটো নাটক রচনা করেন। তারমধ্যে অন্যতম হলো ‘চোর চোর’ নামে চল্লিশ মিনিটের একটি নাটিকা। এর পর নাটিকাটির প্রচুর সংস্কার সাধন করেন নাট্যকার। সংস্কারের পর নাটকটির নাম দেন ‘অমরদাস’। কিন্তু অমরদাস নামে সতনমীদের এক গুরু থাকায় তাঁরা প্রতিবাদ করলে হাবিবজী নাটকের নাম পালটে রাখেন ‘অন্য কোন দাস’ এটিও একজন গুরুর নাম হওয়ায় আবার তিনি পরিবর্তন করে রাখেন ‘চরণদাস’ । কারণ এই নামে কোন গুরুর নাম হতে পারে না।

রাজস্থানী লোককথা অবলম্বন করে বিজয় দান দেতা প্রণীত হিন্দি গল্পকে অনুসরণ করে হাবিব তনবীর ‘চরণদাস চোর’ নাটকটি রচনা করেন। প্রথম অভিনয় ১৯৭৫ কামালী হল, দিল্লী। প্রোযজনা নয়া থিয়েটার। গীত রচণা গঙ্গারাম সখেত এবং স্মরণ কুমার। নির্দেশনা, গীত রচণা, সুরসৃজন এবং মঞ্চপরিকল্পনায় হাবিব তনবীর। ভারত এবং বিশ্বের বিভিন্ন নাট্যশালায় এই নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। নাটকটি একসময়ে মিথে প্ররিণত হয়। হাবিব তনবীরের নাট্যজীবনের সঙ্গে এই নাম চিরকালের মতো একাত্ম হয়ে যায় । ১৯৮২ সালে এডিনবরা ইন্টারন্যাশনাল ড্রামা ফেস্টিভ্যালে ‘চরণদাস চোর’ ফ্রিঞ্চ ফ্রাস্ট সম্মানে ভূষিত হয়। London Times পত্রিকায় বিশিষ্ট নাট্য নর্দেশক পিটার ব্রুক লেখেন – “ Naya theatre is like a group of tarmers being taken to the city by the director , taking care that they donot lose their identity in the city does not affect them adversely . the actors appears in their local dialect with a natural sense of humour.............”. ‘ চরণদাস চোর নাটকের শক্তিশালী দৃশ্য , ভাষা এবং সহজ গল্প এই নাটকের কেন্দ্রিয় শক্তি ।’

চরণদাস কোন সাধারণ চোর নয়। চোখের সামনে ধুলো ছড়িয়ে চুরি বিদ্যায় সে ওস্তাদ । কিন্তু ধরা পড়েনা কিছুতেই। জোতদার , মজুরদার বা কোন চোরা চালানকারী ধনী শোষক যখন গরিবের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তখন আশ্চর্য শৈলীতে জোতদারদের গুদাম থেকে খাদ্যশষ্য সরিয়ে তা গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে। মজুরদারকে বোকা বানায়। সে পেষায় চোর কিন্তু গরিবদের কাছে ভগবান। চৌর্য বৃত্তির জন্য চরণদাস গর্বিত। কথা দিয়ে কথা রাখে। কখনোও বেইমানি করেন না। মিথ্যা কথাও বলেন না। আর পাঁচ জন চোরের মতো সাধারণ চোর সে নয় । বিশ্বাস ভঙ্গকারীকে সে ঘৃণা করে । নাটকে চরণদাসের এক গুরু আছেন । গুরুর কাছে সে প্রতজ্ঞা বদ্ধ, -কোনও দিন সে সোনার থালায় খাবে না ,সোভা যাত্রায় হাতির পিঠে চড়বেন না , রাজকন্যাকে বিয়ে করবেন না , আর যদি কেউ তাকে বিনা শর্তে বিনা অর্থে রাজা হতে বলে সে ফিরিয়ে দেবে সেই প্রস্তাব। এই প্রতিজ্ঞাগুলি চরণদাস গুরুর কাছে সুধুমাত্র কৌতুক ছলে করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে এর সবগুলোই তাঁর জীবনে সত্যে প্ররিণত হয়। রাণী তার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে চরাণদাসকে দেকে ভালোবেসে সোনার থালায় খাওয়ার আহ্বান জানায়। চরণদাস রাজী হয়না। রাণী হাতির পিঠে চড়িয়ে চরণদাসকে সম্বর্ধনা দিতে চান, চরণদাস এটাও পত্যাখান করেন। অবশেষে রাণী বিবাহের প্রস্তাব দেন। চরণদাস এও অস্বীকার করলে রাণী অনুরোধ করেন এ সব কথা কাউকে না বলায় । সত্যের পুজারী চরণদাস জানায় সত্যকে সে গোপন করতে অক্ষম । নিরুপায় হয়ে রাণী চরণদাসের মৃত্যু দণ্ডের আদেশ দেন।

চরণদাস চোর তবু তার কথার দাম আছে। সে সুবিধাবাদী নয়। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনা কিছুতেই। এর জন্য মৃত্যুবরন করতেও সে প্রস্তুত। “চরণদাস চোর, ওস্তাদ চোর। আমাদের চিত্ত হরণ করতেও ওস্তাদ’( হাবিব তনবীরের জোবন ও সৃজন সমীক্ষা – কমল সাহা। ) আসলে চরণদাস হলো সত্যদাস। একজন মদ্যপ যেমন মদ ছাড়তে পারেননা, একজন চোর যেমন চুরিও ছাড়তে পারে্ননা, তেমনি একজন সত্যবাদী সত্যের পদ ছাড়তে পারেননা। এই নাটকের পরিণতি দর্শকের মনকে গভীর বেদনায় ভরিয়ে তোলে। হাবিব তনবীর তাঁর আত্মজীবনীতে নজেই বলেছেন –“ আমার মনে হয়েছিল যে সত্যের পথে অটল থাকায় সক্রেটিসকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। যীশুখৃষ্টকেও মরতে হয়েছিল । মরতে হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীকেও। চরণদাস একজন সাধারণ মানুষ , যে তার প্রতিজ্ঞার জালে ধরা পড়ে য়ায। মৃত্যুকেও ভায় পায়। কিন্তু তার সত্যিই কি কিছু করার থাকতে পারে? মরতে তাকে হবেই, তাই সে মরে । রাণী যখন তাকে অনুরোধকরে কাউকে কিছু না বলার জন্য , তখন সে বলে সত্য তাকে বলতে হবেই। সেই মুহূর্তেই তার জীবন বিপন্ন হয় যখন, রাণীর প্রজাদের সামনে নিজের অস্তিত্ত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্ন এসে পড়ে। যুগ যুগ ধরে ইতিহাস পড়ে আমরা এই তো জেনেছি যে এই ধরনের মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। এই অনিবার্যতাই আমার কাছে প্রকৃত ধ্রুপদী ট্রাজেডী। এই নাটকের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দর্শক হাসে, তারপর নিষ্ঠুর নৈঃশব্দ এসে আক্রমন করে তাদের। এখানেই আমার মতে এই নাটকের সাফল্য। অন্য কোনভাবে শেষ হলে আমার সন্দেহ আছে চরণদাস এত সাফল্য পেত কিনা ”। (আত্মজীবনীঃ হাবিব তনবীর ।। আনুবাদঃ অঙ্কিতা ঘোষ)

বাহাদুর কলারিন হাবিব তনবীরের আর একটি জনপ্রিয় নাটক। এর মূলে আছে ছত্রিশগড়ের মুখে মুখে প্রচলিত জনপ্রিয় একটি লোকগাথা। এটির বিষয় আজাচার । একটু অন্য ধরনের ট্রাজেডী এটি । গ্রীক নাট্যকার সোফোক্লিস প্রণীত Oedipus Rex নাটকের সঙ্গে এই নাটকের মিল পাওয়া যায় ।

বাকহাদুর কলারিন একজন মদ বিক্রেতা রমনীর নাম। যার রাজার সংসর্গে প্রাপ্ত একটি পুত্রসন্তান আছে। এই পুত্রটি ১২৬ জন মেয়েকে বিবাহ করেন। শেষ বিয়ে করার পর তার মাকে বলেন যে; এ পর্যন্ত কোন নারীকেই তার মায়ের মতো সুন্দর মনে হয়নি । মা হতবাক হয়েযান ছেলের ইঙ্গিতে । কিন্তু কিছুই প্রকাশ করেন না। তিনি ছেলের জন্য প্রচুর মশলাদার খাবার তৈরী করে খুব যত্নে খাওয়ান। এত মসলাদার খাবার খেয়ে ছেলে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লে মা জল দেন না এই বাহানায় যে ,ঘরে জল তোলা নেই । পুরো গ্রামকে তিনি আগেই সতর্ক করে রেখেছিলেন – তাঁ ছেলেকে কেউ যেন জল না দেয় । ফলে ছেলে কারোর কাছে জল না পেয়ে ফিরে এলে মা তাকে কুঁয়ো থেকে জল তুলে নিতে বলেন। ছেলে কুঁয়োর ধারে পৌঁছলে তাকে পিছন থেকে ধাক্কামেরে কুঁয়োর জলে ফেলে দেন। এই নাটকটি কোলকাতা ও দিল্লীতে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই নাটক করতে গিয়ে নাট্যকার ছত্রিশ গড়ের লোকনাট্যকে এবং লোকসঙ্গীতকে ব্যবহার করেন। নাটকে কলারিনের ভূমিকায় অভিনয় করে সাফল্য অর্জন করেন আভিনেত্রী ফিদাবাঈ।

হাবিব তনবীরে অনান্য সফল নাটকগুলি হলো – ‘হিরমা কি অমর কাহিনী ’, ‘ মিত্তিকা গাড়ী’, ‘ মাংলু দিদি’, ‘ কেস নং ৪৩২’, ‘ রকাজরক্ত’ ।

ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে হাবিব তনবীরের নাম কখনো মুছে যাওয়ার নয়। সংস্কৃত নাটকের আধুনীকিকরণ, পাশ্চাত্য নাটককে আধুনিক রীতিতে প্রয়োগ , সর্বোপরি ছত্রিশগড়ী লোকনাট্য ও লোকশীল্পকে বিশ্বের দরবারে পোঁছে দিয়েছেন তিনি। এছাড়া নাট-আঙ্গিক ও ভাষার ব্যবাহারের দিকে তাঁর নজর ছিল গভীর। একটি উদাহরণ দিলে এবিষয়ে ধারণা পরিস্কার হবে আশা করি-

“ হাবিলদার ।। আগে বল। চরণ দাস ।। আগে পুরস্কার । হাবিলদার ।। আমার মতো বড় আফিসার কে বিশ্বাস হচ্ছেনা তোর। বেটা বেজন্মা কোথাকার। নে শালা দুটো টাকা নে এখন

অথবা

জুয়াখোর ও গাঁজাখোরদের সম্পর্কে হাবিলদারের উক্তি

হাবিলদার।। এই বেজন্মাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, রাস্তার মধ্যিখানে জুয়া খেলতে বসে গেছে। কাঁড়ি কাঁড়ি টকা নষ্টকরছে। জুয়া খেলার নামে ধ্বংশ করে দিচ্ছে সংসার, ঘরবাড়ী। কুত্তির বাচ্চা সব ! নিজেদের কাজে তোদের লজ্জা হওয়ে উচিত।”( চরণদাস চোর – ইংরেজী অনুবাদ ,আনজুম কাটিয়াল; বাংলা অনুবাদ রথীন চক্রবর্তী )

এই ভাষার ব্যবহারকে লোকধর্মী বলে উপেক্ষা করলে ভূলকরা হবে। কারণ হাবিব তনবীর তাঁর সময়কে, তাঁর চারপাশে সংস্কৃতিকে ছুঁয়ে আধুনিক নাট্যকার-নির্দেশকের সফল জয়মাল্য অর্জন করেছেন ।

সহায়ক গ্রন্থঋণ ও পত্রিকা

‘আমার থিয়েটার ভাবিনা’ –হাবিব তনবীর ; আনুবাদ রথীন চক্রবর্তী । নাট্যচিন্তা। ‘আধুনিক ভারতীয় নাটক’- দিলীপ কুমার মিত্র । দেজ পাবলিশিং । ‘চরণদাস চোর’ – রথীন চক্রবর্তী অনুদীত । ‘আত্মজীবনী’ – হাবিব তনবীর । অঙ্কিতা ঘোষ অনুদীত । ‘নাট্যচিন্তা’ – হাবিব তনবীর সংখ্যা ।

বর্তমানে কেরীচারণা

শারদীয়া ভট্টাচার্য

প্রাবন্ধিক

২০১২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অতিক্রম করলেন দেড়শ’ বছর। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও। ২০১৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ। সাড়ম্বরে উদযাপিত হল তাদের সার্ধশতবর্ষ। মহান ব্যক্তিদের জুবিলি উদ্‌যাপনের এমনই রীত হয়েছে আজকাল। তবে এমন সম্মানের উপযোগী বহু জ্ঞানী-গুণী জন কিন্তু থেকে যান প্রচ্ছন্নে। তাঁদের জীবনের বিশেষ ক্ষণটি আমাদের কারও নজরেও আসে না --- কিংবা আসলেও তা নেহাতই সীমায়িত পরিধির মধ্যে।

এমনই একজন হলেন বাংলা সাহিত্যের গদ্য সংরূপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বা পথিকৃৎ রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরী। ২০১২ সালে তিনি অতিক্রম করে ফেলেছেন আড়াইশ’ বছর। আমাদের,অনেকেরই স্মরণে নেই সে কথা। সত্যি বলতে বর্তমানে সাহিত্যের ছাত্র বা অত্যুৎসাহী পাঠক কিংবা গবেষক ছাড়া আমাদের সকলেরই বিস্মৃতির প্রায় অতলে নিমজ্জিত হতে বসেছেন তিনি।

তবে কেরীকে নিয়ে চর্চা একেবারেই হচ্ছে না বা তাঁর সার্ধদ্বিশতবর্ষ উদ্‌যাপনও একেবারেই হয়নি— একথা বললে অবশ্যই ভুল হবে। তাঁর জন্ম সার্ধদ্বিশতবর্ষ উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচনাচক্র, নানান অনুষ্ঠান। সারা বছরই এই উদ্‌যাপন চলেছে। কোলকাতা ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’তে ৮ফেব্রুয়ারি’২০১২ আয়োজিত হয় একটি সেমিনার। ২১ফেব্রুয়ারি ভাষাদিবসে বোলপুর-শান্তিনিকেতনের পিপিডি উচ্চ বিদ্যালয় আয়োজন করে ভাষায় কেরীর অবদান সংক্রান্ত একটি আলোচনার। আবার ‘এগ্রিহর্টিকালচার সোসাইটি’ এই অনুষ্ঠান পালন করে ঐ বছরেই ২৪মার্চ-এ। এদেশে পদার্পণের পর কেরী বেশ কিছুকাল উত্তরবঙ্গে বসবাস করেছিলেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা কলেজেও উদ্‌যাপিত হয় কেরী জন্ম সার্ধদ্বিশতবর্ষ। এইরকম বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানেই আয়োজিত হয়েছিল আলোচনাচক্র বা সেমিনার। উল্লেখের অবকাশ রাখে না শ্রীরামপুর কলেজেও এই উপলক্ষ্য পালন করা হয়েছে বেশ জমক করেই। কলেজ ছাড়াও কেরীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয় শ্রীরামপুর পৌরসভাতেও। এমন আরও কিছু প্রতিষ্ঠানেও পালিত হয়েছে এই উৎসব, প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থ। তবে এই প্রসঙ্গে বলা দরকার এই উৎসব মূলত সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে সেইসব প্রতিষ্ঠানে যেখানকার সাথে কেরীর প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। এবং এই উৎসবগুলি প্রধানত গণ্ডিবদ্ধ হয়েছে আলোচনাচক্রের মধ্যেই। এছাড়াও সার্বিকভাবে কেরীকে নিয়ে চর্চনা করছেন অনেক পণ্ডিতব্যক্তিই। কেরীচর্চা সংক্রান্ত আলোচনার বিস্তারে যাওয়ার আগে এক স্মৃতির স্মরণি বেয়ে চলে যাব কেরীর আমলে। মনে করে নেব তাঁর পরিচয়টি।

আদি থেকে পদ্যবাহিত বাংলা সাহিত্যে দলিল দস্তাবেজ বা পত্রাদি ছাড়া গদ্যের নিদর্শন তেমন মেলে না। এই রীতিই চলে আসছিল। এমত অবস্থায় ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি উইলিয়ম কেরী ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ১৭৯৩ সালে ভারতের মাটিতে পা রাখেন।

কেরীর আগমনের কাল ছিল ভারতের বিপর্যস্তের সময়। বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সূচিত হয়েছে বদল। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, বহিরাগত দস্যু, বর্গীদের আক্রমণ, ব্রিটিশ কর্মচারিদের অত্যাচার প্রভৃতির প্রকোপে বাংলা ও বাঙালি ভাঙনের মুখে। এই বিশৃঙ্খল বাংলাতেই উইলিয়ম কেরীর আগমন।

বাংলায় এসে নানান কর্মযোগের মধ্যে দিয়ে কেরীর সময় অতিবাহিত হতে থাকে। ১৮০১ সাল নাগাদ উইলিয়ম কেরী দায়িত্ব পান ভারতে আগত ইংরেজ সিভিলিয়নদের বাংলা শেখাবার। খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত শ্রীরামপুর মিশনের কর্তৃত্বভারে থাকা উইলিয়ম কেরী বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যক্ষরূপে যান নব্যস্থাপিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে।

কেরী মনে করেছিলেন বাংলা শাসনকার্যের জন্য বাংলাভাষা শিখতে গেলে যেমন শেখা দরকার বাংলা ব্যাকরণ তেমনি প্রয়োজন বাঙালি সাধারণ সমাজের ভাষা রপ্ত করা। আর সেই তাগিদেই তিনি ব্যাকরণ গ্রন্থ ও ‘কথোপকথন’ রচনা (মতান্তরে সংকলন) করে ফেলেন। বাংলা সাহিত্যে পূর্বে স্বল্প অঙ্কুরিত গদ্যসাহিত্য কেরীর হাত ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। বাংলা গদ্যে কৃত্রিম সংস্কৃতানুগ ভাষার জায়গায় স্থান পেল কথ্যভাষা। এছাড়া কেরীর সংকলন গ্রন্থ ‘ইতিহাসমালা’, ৩৫টি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ, একাধিক ভাষায় অভিধান রচনা ও অনেক গ্রন্থ প্রকাশ কারও অবিদিত নয়। উইলিয়ম কেরীর এই পদক্ষেপ বাংলায় গদ্যসাহিত্যকে প্রসারিত করে বৈ কি।

এসব ছাড়াও রেভারেণ্ড কেরী আরও নানা ধরণের কাজ করেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’, ‘এগ্রিহর্টিকালচার সোসাইটি’, হাসপাতাল ইত্যাদি। তাঁর উল্লেখযোগ্য আর একটি কর্মযজ্ঞ বাংলার নানাবিধ কুসংস্কার বিলোপ। শেষোক্ত প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয় কেরী লাইব্রেরীর কিউরেটর শ্রীযুক্ত তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য—

“তখনকার দিনে কুষ্ঠরোগীকে পিটিয়ে হত্যা বা জ্যান্ত কবর দেওয়ার প্রথা ছিল। কেরী কলিকাতায় কুষ্ঠরোগীদের সেবার জন্য হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ নেন।...মিশনারীরা কেরীর নেতৃত্বে গঙ্গাজলি, বাণফোঁড়া, আত্মহনন বা জগন্নাথের রথের চাকায় প্রাণ বিসর্জনের মাধ্যমে পুণ্য সঞ্চয়ের মতো সামাজিক কুপ্রথাগুলি প্রতিরোধের জন্য সর্বদা আন্দোলন চালিয়ে যান।

“১৮০২ সালে সাগরে শিশু বিসর্জন তাঁরই প্রচেষ্টায় নিষিদ্ধ হওয়ায় প্রথম সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে সাফল্য আসে। তারপরই ১৮০৪ সালে সরকার সতীদাহ প্রথা সম্পর্কিত প্রথম পরিসংখ্যান পেশ করার জন্য কেরীকে ভার দেন। উক্ত প্রথা শাস্ত্রসম্মত কিনা তার প্রমাণপঞ্জি, মৃত্যুঞ্জয় রচিত শাস্ত্রীয় অনুশাসন বহির্ভূত পাণ্ডুলিপিসহ কেরী লর্ড ওয়েলেসলীর দরবারে পেশ করেন। তবে গভর্ণর স্বদেশে প্রস্থান করায় অনেকদিন বিষয়টা স্থগিত থাকে। ... রাজা রামমোহন রায় ১৮১৪ সালের পর কলিকাতায় আসেন। ... রামমোহন দীর্ঘদিন পরে বিষয়টা সরকারের কাছে উপস্থাপন করেন। কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোকও কেরী ও রামমোহনকে সঙ্গ দেন। রামমোহন নয়, কেরীর সর্বাধিক উদ্যমেই ১৮২৯ সালে ৫ই ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা আইন মোতাবেক নিবারণ করেন এবং ঐদিনই বিশেষ দূতের হাতে তার বাংলা ভাষার অনুবাদ করার জন্য কেরীকে পাঠিয়ে দেন। সেদিন রবিবার, তবুও বৃদ্ধ ধর্মযাজক সমাজকল্যাণকামী কেরী সারাদিন ধ’রে পরিশ্রম ক’রে আইনের বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত করে নিজে গভর্ণরের হাতে তুলে দেন।”

(কেরী সাহেব ও তৎকালীন বঙ্গ তথা শ্রীরামপুর সমাজ/ পৃঃ ৬৪,৬৫)

বাংলার সাথে তথা এদেশের সাথে এভাবেই সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন কেরীসাহেব। তো গুণীজনেরা যে এমন মানবদরদী নবজাগরণের অগ্রপথিককে নিয়ে চর্চা করবেনই সেকথা বলাই বাহুল্য। এই আলোচনার বিস্তারে যাওয়া যাক কেরীর জন্মোৎসব প্রসঙ্গের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যাঁদের নাম মনে হয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম ড. মীর রেজাউল করিম। এশিয়াটিক সোসাইটির আলোচনাচক্রে তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল— ‘কেরীর কথোপকথন’। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে বহু বিদ্বজ্জন কেরী সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন সকলের কাছে। যেমনঃ

ড. সরস্বতী মিশ্র – কেরীঃ ইংরেজী বাংলা অভিধান

ড. অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায় – কেরী ও ব্যাকরণ

ড. ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় – উইলিয়ম কেরী ও সংস্কৃতচর্চা

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় – কেরী ও শ্রীরামপুর কলেজ

ড. চন্দ্রমল্লি সেনগুপ্ত – লোকককথার আলোকে কেরীর ইতিহাসমালা

ড. শতাব্দী দাস – উইলিয়ম কেরীর বিজ্ঞানভাবনা

ড. সন্দীপ সিন্‌হা – কেরী ও তাঁর সহযোগীরা

এই সকল অধ্যাপক ছাড়াও এই সেমিনারগুলিতে অংশগ্রহণ করেছেন নির্মল দাশ, পল্লব সেনগুপ্ত, পুষ্পজিৎ রায়, বরুণ কুমার চক্রবর্তী, বিকাশ রায়, তৃপ্তি চৌধুরী সোহারাব হোসেন, অলোক রায়, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, সাইফুল্লাদের মতো অধ্যাপকমণ্ডলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহসম্পাদক শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা। এই নামোল্লেখ থেকে সহজেই ধারণা করা যায় বিদ্বজ্জনেরা বাংলার নবজাগরণের এই অগ্রপথিক কেরীকে নিয়ে যথেষ্ট চর্চা করেন।

এছাড়া উইলিয়ম কেরীর কিছু রচনা একত্রে প্রকাশ করে এশিয়াটিক সোসাইটি। এবং এখানকার Transaction নামক পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয় কেরীর ১৮১১সালের একটি বক্তব্য।

এইভাবেই সার্ধদ্বিশতবর্ষে কেরীকে সম্মান জানিয়েছেন বাঙালি। তবে কেবল জন্মোৎসব পালনই নয়, সার্বিকভাবে উইলিয়ম কেরীকে নিয়ে সুপন্ডিতেরা নানান কাজ করেছেন বা করছেন। সম্প্রতি সাইফুল্লা, মীর রেজাউল করিম ও তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে কেরীর ‘কথোপকথন’। গ্রন্থটিই যে কেবল মুদ্রিত হয়েছে—তা কিন্তু নয়। গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ থেকে প্রাপ্ত পাঠভেদ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে এখানে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত কথোপকথনের অসম্পূর্ণ রূপগুলি এবং বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে সংকলিত কথোপকথন সংগ্রহ ক’রে তাদের তুল্যমূল্য বিচারের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ মুখবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে এখানে। পণ্ডিত মহলে করুণা পাবলিকেশনসের এই সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থটি খুবই সমাদৃত হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি পুণর্মুদ্রিত হয়েছে ‘ইতিহাসমালা’ও। অবশ্য এর আগে ফাদার দ্যতিয়েন এই গ্রন্থ পুণর্মুদ্রিত করেন।

কেরীচর্চা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ড. সুরঞ্জন মিদ্দের নাম। উইলিয়ম কেরী ও তৎসংক্রান্ত আলোচনা শ্রীযুক্ত মিদ্দের বিশেষ ভালবাসার বা পছন্দের বিষয়। সুতরাং তিনি যে এই ব্যাপারে ওতপ্রোত জড়িত থাকবেনই সে আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

শ্রীরামপুর মিশনের ‘কেরী লাইব্রেরি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার’(CLRC)-এর প্রাক্তন লাইব্রেরিয়ান সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং বর্তমান কিউরেটর তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ এই প্রসঙ্গে অবশ্য কর্তব্য। সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় কেরীকে নিয়ে রচনা করেছেন একাধিক গ্রন্থ, প্রবন্ধ। তাঁর উদ্যোগই CLRC-কে আরও সুন্দর ক’রে সাজিয়ে তুলেছে। আর শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তো গণিতের অধ্যাপক হয়েও অবসর গ্রহণের পর কেরী লাইব্রেরিতে কিউরেটর পদ পাওয়ার পর থেকেই কেরীকে নিয়ে নানান গবেষণা করে চলেছেন এবং রচনা করে চলেছেন প্রবন্ধ-গ্রন্থ। সংকলন করেছেন কেরীসংক্রান্ত বিদগ্ধজনের রচনামালা। কেরীর সার্ধদ্বিশতবর্ষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সেমিনারগুলিতে তাঁর বক্তব্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ‘কেরী সাহেব ও তৎকালীন বঙ্গ তথা শ্রীরামপুর কলেজ’ গ্রন্থটি। এখানে যেমন উইলিয়ম কেরীর জীবন অঙ্কিত হয়েছে তেমনি তাঁর নানান জানা-অজানা কার্যাবলীর বিবরণ বিশ্লেষিত ও স্পষ্ট হয়েছে সকলের কাছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শক্তিব্রত ঘোষের ‘উইলিয়ম কেরীঃ সাহিত্য ও সাধনা’ অতি মূল্যবান একটি গ্রন্থ।

শ্রীরামপুর মিশন বা CLRC কেরীকে আজও কীভাবে স্মরণ করে সে বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করব। তার আগে উল্লেখ করি মালদা জেলায় পুষ্পজিৎ রায় মহাশয়রা কেরীর স্মৃতিসৌধ স্থাপন করেছেন। সেখানে প্রতি বছর কেরীর জন্মদিন (১৭অগস্ট) উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে। আমন্ত্রিত হন বহু জ্ঞানী-গুণী জন। কেরীকে স্মরণ করা হয় নানা উৎসবের মধ্যে দিয়ে। পণ্ডিতদের সুবক্তব্যে, আলোচনায় কেটে যায় মেলার দিন ক’টি।

এবার আসি শ্রীরামপুর মিশন ও CLRC প্রসঙ্গে। এখান থেকে সমানে প্রকাশিত হয়ে চলেছে নানা পত্রিকা, পুস্তিকা, গ্রন্থাবলী। প্রতি বছর এখানেও কেরীর জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয় জাঁকজমক করে। কেরী দিবস হিসেবে চিহ্নিত ১৭অগস্ট দিনটিতে এখান থেকে প্রকাশিত হয় একটি স্মারক পত্রিকা এবং আয়োজিত হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান। সকাল থেকে সারাদিন চলে এই অনুষ্ঠান। প্রভাতফেরি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, ফুটবল ম্যাচের ইত্যাদি আয়োজন করা হয়।

স্মারক পত্রিকাগুলির থেকেও অনেক কেরী-গবেষক বা কেরীপ্রেমীর নাম ও তাঁদের ঋদ্ধ রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। শৈলেশ মুখোপাধ্যায়, শিশির কুমার দাস, বহ্নিশিখা ঘটক প্রমুখেরা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

কেরী মিউজিয়াম ও লাইব্রেরিটিও শংসার অধিকারী। লাইব্রেরিতে সযত্নে রক্ষিত আছে কেরীর প্রায় সকল রচনা, প্রকাশনা, কেরীসংক্রান্ত বিভিন্ন রচনা, পত্র-পত্রিকা। মিউজিয়ামটিও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবিদার। সেখানে কেরীর হস্তাক্ষর, পত্রাদি, একাধিক ভাষায় লেখা বাইবেলের প্রথম পৃষ্ঠাগুলি সযত্নে সুশোভিত হচ্ছে। রয়েছে কেরীসম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাবলী, চিত্রাবলী। সবমিলিয়ে মিউজিয়ামে ঢুকলে যেন দেখা পাওয়া যায় জীবন্ত উইলিয়ম কেরীর।

**আন্তর্জা্লে উইলিয়ম কেরীঃ**

আজ ইন্টারনেট, গুগ্‌ল, উইকিপেডিয়া ছাড়া বিশ্ব অচল। রান্নার রেসিপি থেকে চটজলদি পথনির্দেশিকা সবেতেই সহায় আন্তর্জালিক জগৎ। ঠিক তেমনি সাহিত্য-বিজ্ঞান যেকোনও বিষয়ে খোঁজ পাতলেই কল্পতরুর মতো টুপ করে সে সংবাদ দেয়। মোদ্দা কথা ইন্টারনেট আমাদের জানায় যেকোনও কিছুর বা যেকোনও কারও whereabouts. যা বাইরে বইয়ের দোকানে বা লাইব্রেরিতে গিয়ে জানা নিতান্তই সময়সাপেক্ষ, তা পলকেই পেয়ে যাই ইন্টারনেটে।

রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরীও ধরা পড়েছেন এই জালে। কেরীর জীবনবৃত্তান্ত সংক্রান্ত কয়েকটি ওয়েবসাইট ও লিঙ্কঃ

en.wikipedia.org/wiki/William\_Carey\_(missionary)‎

William Carey:

[www.christianitytoday.com](http://www.christianitytoday.com)

William Carey— wholesome words:

[www.wholesomewords.org/biography/biorpcarey.html](http://www.wholesomewords.org/biography/biorpcarey.html)

এছাড়া উইলিয়ম কেরীর কীর্তিসম্ভার একপলকে তুলে ধরা হয়েছে এখানেঃ

[www.wmcarey.edu/carey/links](http://www.wmcarey.edu/carey/links)

আবার এখান থেকেই বিস্তারিতভাবে উন্মুক্ত হয় আরও নানান দিকঃ

[www.wmcarey.edu/carey/bibles/translation.html](http://www.wmcarey.edu/carey/bibles/translation.html)

এখানে কেরী অনূদিত ও প্রকাশিত বাইবেল সংক্রান্ত তথ্যাবলী মেলে সহজেই। এছাড়াও আন্তর্জালে সংরক্ষিত আছে কেরীর একাধিক ভাষায় রচিত অভিধান। যা বাইরে বইয়ের দোকানে বা লাইব্রেরিতে গিয়ে জানা নিতান্তই সময়সাপেক্ষ, তা পলকেই পেয়ে যাই ইন্টারনেটে।

জর্জ স্মিথ-এর ‘The life of William Carey’-এর লিঙ্কঃ

[www.wmcarey.edu/carey/gsmith.smith.html](http://www.wmcarey.edu/carey/gsmith.smith.html)

এছাড়া http://www.wmcarey.edu/carey/electronic-books/articles/wc-journalism.pdf এই লিঙ্কটিতে পাওয়া যায় The Writings of William Carey: Journalism as Mission in a Modern Age.

উইলিয়ম কেরীকে নিয়ে চিত্রপরিচালক টনি ডিউ তৈরি করেছিলেন তথ্যচিত্র ‘ A Candle in the Dark: the Story of William Carey’. এ সম্পর্কে উল্লেখিত লিঙ্কটিঃ

[www.imdb.com/title/tt1316049](http://www.imdb.com/title/tt1316049)

শুধু এই ক’টিই নয় আরও অনেক ওয়েবসাইট আমাদের ঋদ্ধ করেছে উইলিয়ম কেরী সম্পর্কে।

আলোচনার ছেদ টানার সময় বলি কেবল বইয়ের পাতায় বা সাহিত্যপাঠক্রমে কিংবা সীমায়িত প্রতিষ্ঠানে ও কেবল গুণীজনদের আগ্রহে উইলিয়ম কেরীকে গণ্ডিবদ্ধ না রেখে আমরা সকলেই যদি তাঁর আসন পাতি আমাদের সাধারণ সকলের হৃদয়ে তবেই বুঝি তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এসে মানবদরদী যে মানুষটি বাংলা ও বাঙালির জীবনে যে যুগান্তর এনেছেন এই সম্মান তো তাঁর মতো মানুষেরই প্রাপ্য। সবশেষে নিজের অকপট স্বীকারোক্তিঃ আমার স্বল্প জ্ঞান, যোগাযোগের অভাবে এই ক্ষুদ্র পরিসরে অধরা রয়ে গেল অনেক তথ্য অনেক গুণীজনের নাম।

ঋণস্বীকার:

লাল্টলুয়াংলিয়ানা খিয়াংটে/অধ্যক্ষ/ শ্রীরামপুর কলেজ

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/ কিউরেট/ কেরী লাইব্রেরি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার

শৌভিক দাশগুপ্ত/ অধ্যাপক/ শ্রীরামপুর কলেজ

‘কথোপকথন’/ করুণা পাবলিকেশনস্‌

বেঁচে থাকার কঠিন লড়াই: সাম্প্রতিক কালের বাংলা আখ্যান

অনুপম সরকার

গবেষক, বাংলা বিভাগ

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভবিষ্যৎ বর্তমান হয়, বর্তমান অতীত – এ যেমন সত্য, তেমনি এ কথাও সত্য যে, অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে যেতে হয়। আর মানুষের জীবনে এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিই অধিকতর ক্রিয়াশীল। এরই নাম ইতিহাস, ক্রমবিকাশও একেই বলে। সমাজ, রাজনীতি ও জীবন ধারায় ভাঙচুর ও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে জীবন এই প্রক্রিয়াতেই অগ্রসর হয় আর এই ধারাতেই ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতি নিজেকে আবিস্কার করে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও একুশ শতকে সাহিত্য ও ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আখ্যানতত্ত্বের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে। আজ ইতিহাসের তথ্যগত সত্যতাই একমাত্র বিবেচ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ একসময় বলেছিলেন, ইতিহাসের সংশ্রবে উপন্যাসে যে বিশেষ রস সঞ্চারিত হয়, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, সত্যের প্রতি তাঁর কোনও খাতির নেই – এই বয়ানও আজ তাই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। আসলে যে কোনও নির্মাণের মতোই ইতিহাসও এক নির্মাণ মাত্র। এই নির্মিত সত্য নিয়ত পরিবর্তমান একটি ধারনা যা চিরন্তনও নয়, মহান নয়, নিত্য ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী। এই নশ্বরতাকে স্বীকার করেই আজকের ইতিহাসের যাত্রা, আজকের আখ্যানের প্রবাহমানতা। সময়ের পরিবর্তনের সাথে প্রজন্মান্তরের চেতনার পরিবর্তন হয়, যুগের পরিবর্তন হয় এবং সেই পরিবর্তনের ঢেউ এসে সমজকেও আঘাত করে। বিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকেই রাজনীতি থেকে শুরু করে অর্থনীতি বাঙালির বিশ্বাসকে যে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে তাঁতে তুলোট কাগজের মতোই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে পুরনো মূল্যবোধ, মানুষের ভিতরে জেগেছে অস্থিরতা ও সংশয়। পরস্পর বিরোধী চেতনা নিয়ে সাধারণত সময় বর্তমান থাকে। একটি ধারা স্থিতাবস্থাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়, অন্য ধারাটি চায় স্থবিরতাকে উতরে সামনের দিকে অগ্রসর হতে। প্রথমটি পশ্চাৎমুখী, পরেরটি অগ্রসরপ্রবণ। এক সময় দুটি ধারার মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং স্থাণুকে পরাজিত করে অগ্রবর্তী সময়চেতনা নতুন ক্ষেত্রে এসে স্থির হয় এবং পরবর্তীকালে সেই ক্ষেত্রোথিত চেতনায় ফের দ্বন্দ্বের খেলা জমে। ইতিবাচক সময় এভাবেই সামনে অগ্রসর হয়।

উৎপলেন্দু মণ্ডল এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ লেখক। তাঁর বেশীরভাগ লেখাই সুন্দরবন কেন্দ্রিক। ওই অঞ্চলের মানুষজনের সুখ, দুঃখ, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, শিক্ষা, অশিক্ষা, আর বেঁচে থাকার লড়াই তাঁর অধিকাংশ লেখার মূল উপজিব্য। তাঁর “ ‘আয়লা সময় অসময়’ ধ্বংসের ধারাবিবরণী, বাপকাকাদের ভিটেয় আয়লার জলোচ্ছ্বাস। সর্বস্ব হারানো মানুষগুলো, অন্য ঠিকানা খুঁজতে ব্যস্ত। তখন আয়লার নদী পূর্বাশ্রমে ফিরে যায়। মানুষ আর ফিরতে পারে না। যদিও বা ফেরে – তখন সব হারানো এক মানুষ। কিংবা মানুষ নয় অন্য কিছু– এই অন্য কিছুতে রাষ্ট্রের, রাজপুরুষদের কিছু যায় আসে না। আসে রিলিফ। করুনাময় দেবতার নামে – নাম সংকীর্তন হয়। বছর গড়ায়। আবাদমলের মাটি নোনা হয়। নিস্ফলা মাটি আর নিষ্কর্মা লোকগুলো পাড়ি দেয় দক্ষিনে। ”

মানুষের অসহায়তা-নিরাশ্রয়তাকে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। যেখানে প্রতিটা দিন বাঁচার অর্থ কেবলই সংগ্রাম । মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার সময় যেন নিমেষে বদলে গেছে। তেষ্টা মেটাবার পানীয় জলটুকু আজ মেলা ভার। জীবন সম্পূর্ণ নোনতা স্বাদে বদলে গেছে। “চারপাশের সব জল নোনা । নোনা বিষ সাঙ্ঘাতিক, গায়ে খোস পাঁচড়া হয়। দরকার একটু মিষ্টিজল। সে জল আর পাবে কোথায় ? ঐ টিউবওয়েলের জল নিতে হবে। আবার জলের মতো নোনা জলে চান করতে হবে। হ্যাঁ দেখে নিস তোর ঐ গতরে পোকা পড়বে। ততক্ষণে দলটা এগিয়ে চলেছে, গাঙভেড়ী দিয়ে যাওয়া যাবে না। তার উপর দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। গোয়ালবাড়ি দিয়ে যাওয়া যায়। জ্যাঠা মারা যাওয়ার পরে সব শেষ। তিনটে বড় বড় ঘর নিয়ে ছিল গোয়ালঘর। সে সব শেষ। সেখানেও জল, ডান দিকে জ্যাঠার বড় পুকুর। কত দিনের মাছ সব রেখে দিত। ছেলের বিয়ে হবে। তখন কাজের সময় আর মাছ পাওয়া যাবে না। সেই পুকুরে এখন নোনা জল খেলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোনপথ দিয়ে যাবে। নদীর জল, বাঁধ ছাপিয়ে শান্তিলাল খুঁজছে। তার বাপ, কাকারা, সব শান্তিখালের পাড়ে বাড়ি করেছে। সেসব বাড়িতে এখন জল ঘোলাচ্ছে।” (পৃষ্ঠা-১৬)।

এসবের মাঝে আছে একদল সুবিধাভোগী–ঠকবাজের দল, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি হয়ে গেলে আর কারুর কথায় ভাবে না। কে বাঁচল, আর কে বা মরলো তাতে তাঁদের কিছু যায় আসে না। এই ধরনের মানুষ চিরকাল ধরেই সমাজে রয়ে গেছে । রাজনীতির আদপ-কায়দা বুঝে নিতে এঁদের দেরি হয়না । ফলে যে প্রকৃত অসহায়, সে চিরদিন বঞ্চিত থেকে যায় আর চালাক বুজরুকবাজের দল ফুলে ফেঁপে বেড়ে উঠে। “অদ্ভুতভাবে শুক্রী মালী বেঁচে গেছে। বেঁচে গিয়ে অশান্তি কম না- সবাই টাকা পেয়েছে শুক্রী আর পায়নি। শুক্রীর এক ভাই সোনারপুরে রাজমিস্ত্রির কাজ করে, সেও টাকা পেয়েছে। কিন্তু শুক্রী পায়নি। মহাদেব পাগলা পায়নি। প্রশাসন পাগল ছাগল দেখেনা। সহদেব পাগলা প্রতিদিন পালা করে বসে থাকে। পঞ্চায়েত অফিসের বারান্দায় গিয়ে বসে। নদীর চড়ে বাটাং পাখি দেখে হাততালি দেয়। ইঞ্জিনভ্যান দেখে ভাবে রিলিফ আসছে। সবাইকে জিজ্ঞেস করে কবে টাকা পাওয়া যাবে।” (পৃষ্ঠা-৯০)

উৎপলেন্দু মণ্ডলের এই আখ্যানে মানুষের আত্মোপলব্ধি ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সমান্তরাল ভাবে পৌরসমাজের গভীরে গ্রামীন শক্তির বিন্যাসও ধীরে ধীরে পাল্টে যেতে থাকে। “কালো কমরেড দেখছিল, তাদের কিছু করার নেই, তাদের লোক চলে গেছে ওদের দলে। ওখানে এখন পয়সা। পয়সা যেখানে হবে সেখানে তো লোক যাবেই- কি আর করা যাবে। কিছুই করার নেই । ... মনে মনে কালো বলে আর আমাদের ক্ষমতা নেই। এবার সব তোমাদের বাড়ির লোকদের, তোমার কাকা জ্যাঠার ছেলেরাই করবে।” (পৃষ্ঠা- ৯৫-৯৬)। তাই “নোনতা স্বাদে-গোত্রে ‘আয়লা সময় অসময়’ এক অন্যরকম কাহিনী।”

তৃষ্ণা বসাকের ‘বারিঘর’ “উপন্যাসের ভরকেন্দ্রও নিরাশ্রয়তা। গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে ঘটলেই হিংসা, সন্ত্রাসের ভয়াবহতা কমে না, বিস্তার কিছু ছোটো হয় – এইমাত্র। আরো অনেক ছোট-বড়, কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগ বল– এর বিভিন্ন তলে ক্রিয়াশীল, যারা কথাবস্তুর একমুখিনতাকে ভেঙে দিতে চেয়েছে নিজেদের মতো করে।”

আখ্যানের শুরু থেকেই লেখিকা স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়েছেন। ঢুকে গেছেন সমস্যার অতলে। এ এক পরিবারের কাহিনী যেখানে শুরুতেই ঘটে গিয়েছে এক দুর্ঘটনা। আর সেই দুর্ঘটনায় বদলে গিয়েছে সকলের জীবন। যেখানে কোনও কিছুরই নিশ্চয়তা নেই। “নিজের ঘরটুকু, চার ঘণ্টার চাকরি আর আত্মহননের ধিকিধিকি ইচ্ছে– এই সব দিয়ে একটা শামুকখোল বানিয়ে নিয়েছে অজিত ঘোষাল। হ্যাঁ, নিজের ঘর। শুভাশিসের মৃত্যুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে পারেন তিনি।” (পৃষ্ঠা-৭)।

যখন ঋতুর আসা-যাওয়াও ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারে না মানুষ তখন বোঝা যায় সমস্যা কত গভীর। আধুনিক কৃত্তিম জীবন যাপন কিছু দিন পরেই মানুষের মনে পরিবর্তন আনে। কারুর কাছে তা হয়ে উঠে দমবন্ধকর পরিস্থিতি আবার কেউ কেউ সেই পরিবেশেই নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। কারুর স্বাভাবিক সম্পর্কগুলো নষ্ট হয়ে যায় আবার কেউ কেউ জড়িয়ে পড়ে নতুন সম্পর্কে। “কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা, বিশ্বাস– এগুলো যে বড় দামি জিনিস, বড় কস্ট করে বুঝেছে বিশাখা। দেবাশিসদার কথাটা সত্যি, তাকে বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু কোথায়? আর কতদূর হাঁটলে সে নিজের বাড়িতে পৌঁছবে? পৃথিবীতে কোথাও কি তার জন্যে একটু জায়গা আছে ? নেই, তার জায়গা তাকেই করে নিতে হবে। হাতে এক মুঠো ধুলো নিয়ে কি একটা গোটা বাড়ির স্বপ্ন দেখা কি মানায়?” (পৃষ্ঠা-৭০)

যৌনতাকেও খুব সচেতনভাবে এই উপন্যাসে এনেছেন লেখিকা। কখনই তা আখ্যানের গতিকে নষ্ট করেনি। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের জীবনে যৌনতার গুরুত্ব যে কতখানি তা সম্ভবত নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেনা। লেখিকা খুব যত্ন করে বিষয়টিকে আখ্যানে ব্যবহার করেছেন। “আজ অচিন যখন ওকে ডাকল, তখনও বিশাখা, নিজের মধ্যে গুটিয়ে ছিল। কিন্তু এই জায়গাটাই এসে, শরীর ক্রমশ তরল হয়ে যাচ্ছে বিশাখার। নদীর মতোই বয়ে যেতে চাইছে। আধো অন্ধকারে অচিন দেখল বিশাখার প্রদীপ শিখার মতো দুই চোখের তলায় গভীর কালি। সেই কালো গিরিখাত দিয়ে গঙ্গা নামছে । অচিন বিশাখার মাথা ওর কাঁধে টেনে নিল।” (পৃষ্ঠা-৬৩)।

এই সময়ের আরেক গুরুত্বপূর্ণ লেখক সুকান্তি দত্ত মনে করেন, “জীবন ঘনিষ্ট বিশ্বাস্য– বাস্তবের মায়া সৃজনের তাগিদ থেকে উপন্যাসের জন্ম হলেও, জীবনপ্রবাহের নানা পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যে তার নানা রুপবদল ঘটেছে।...গত কয়েক দশক ধরে বিশ্বজুড়ে সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির নানা বাঁকবদল, জ্ঞানচর্চার নানা নতুন দিকের বিস্তার জন্ম দিয়েছে মীমাংসাহীন জীবনবোধ, বহুস্বরিক জীবনব্যাখ্যা। ...সব মিলিয়ে মননশীল শিল্পসচেতন বাংলা উপন্যাস নানা নতুনতর বৈশিষ্ট্য অর্জন করে চলেছে।” আসলে সত্যি খুব দামি কথা বলেছেন সুকান্তি দত্ত। বাংলা উপন্যাস সত্যি আজ এক জায়গায় থেমে নেই। বাস্তব অন্বেষণের বৈচিত্র্যময় পথে আজকের বাংলা উপন্যাসের যাত্রা। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়,অমর মিত্র, প্রমুখ কথা সাহিত্যিকদের হাত ধরে বাংলা আখ্যানের এই বাঁকবদল। আর এই যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তরুণ প্রজন্মের কিছু মেধাবী সাহিত্য সাধক। সুকান্তি দত্ত তাঁদের মধ্যেই একজন।

‘মায়াউড়ান’ সুকান্তি দত্তের তৃতীয় উপন্যাস। “সত্তরের গণ-আন্দোলনের শহিদ পুত্র রাজনৈতিক কর্মী শ্যামসুন্দর মায়ানগর পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল মেম্বার। দলের ভেতরে-বাইরে তার লড়াই অসাধু প্রমোটার – ঠিকাদার – রাজনৈতিক চক্রের বিরুদ্ধে। তার পিঠে জেগে উঠল একজরা ডানা, সে উড়ে বেড়ায় নদী – পাহাড় – সমুদ্র – আকাশে, কথা বলে তর্ক করে নানা চরিত্রের সঙ্গে, ধৃতরাষ্ট্র পুত্র বিকর্ণর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখনওবা সে নিজেই বিকর্ণ হয়ে যায়। প্রেমিকা শ্রীরাধাকে নিয়ে উড়ান দিতে চায় আকাশে । আলো আঁধারময় কুহকমগ্ন কথন শৈলীতে উঠে আসে ক্ষমতা রাজনীতি সহ জীবন ঘিরে নানা প্রশ্ন সংশয় অনুভব। জিজ্ঞাসা ও স্বপ্ন, প্রতিবাদ ও প্রেমের এই নতুন স্বাদের আখ্যান বাংলা উপন্যাসের মননশীল শিল্পসচেতন ধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ।”

উপন্যাসের বয়ানে সময় একেবারেই যুগপৎ অন্তর্বৃত ও বহিবৃত। সময় ও পরিসরের ক্রম নির্ভর বিন্যাস আখ্যানের পক্ষে আবশ্যিক। আলো আঁধারময় কুহকমগ্ন অসম্ভবের দ্যোতনায় এই উপন্যাসে লেখক ভরাট করতে চেয়েছেন যাবতীয় শূন্যস্থান। বাংলা কথাসাহিত্যের পরিচিত কাহিনীনির্ভর প্রচলিত কথনশৈলী থেকে সচেতনভাবে সরে এসেছেন লেখক। নন্দনের স্বাতন্ত্র্যময় উপস্থিতি পাঠকের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। বিস্ময়বোধের পুনরুজ্জীবনের মধ্যে দিয়েই আখ্যানকার গড়ে নিতে চান অদৃশ্য এক সেতু। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে যায় ইতালো ক্যালভিনোর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘সিক্স মেমোস ফর দি নেক্সট মিলেনিয়াম’-এর উপসংহারের কথা । তাঁর মতে, “Who are we, who is each one of us, if not a combination of experiences, information, books, we have read, things imagined ? Each life is our encyclopedia, a library, an inventory of objects, a series of styles and everything can be constantly shuffled and reordered in every way conceivable.”

রাজনৈতিক ভাবাদর্শের তাৎপর্যপূর্ণ উপস্থিতি আখ্যানের পরিস্ফুটনে কখনও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। বিষয়বস্তু গৌণ হয়ে উঠে নি কখনও। আসলে ভারতবর্ষের রাজনীতি, অর্থনীতি, থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত স্তরেও যে বিকল্প সন্ধানের প্রয়াস স্বাধীনোত্তরকালে লক্ষ্য করা গেছে, তাতে অন্য মাত্রা যোগ করেছেন লেখক। মনের অতলের স্পন্দন ও রুপবদলকে যারা সাহিত্যের পাতায় ফুটিয়ে তোলেন তাঁরা নিঃসন্দেহে বড় মাপের শিল্পী। ‘মায়াউড়ান’ পাঠ করে পাঠকের সম্ভবত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

‘চরণ’ উপন্যাসের লেখক শরদিন্দু সাহা “সকল প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামি, অনুশাসন এবং শোষণ মুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেন, আর এই বাসনাতেই তার কলম ধরা। ভারতবর্ষ উচ্চ কৃষ্টি ও বহুধা মিশ্রিত সংস্কৃতির দেশ। কিন্তু আজ তার এ কী পরিণতি! সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক শক্তির হাতের তালুতে বন্দী, শিক্ষিত শ্রেণী হচ্ছে রাজনীতির দাবার ঘুঁটি, রাজনেতাদের আশ্রিত মস্তানদের উল্লম্ফনে সংকুচিত, শিহরিত সকলে, পোশাকি গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে মানুষের বাকশক্তি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কৌশলে; আদেশ পালনে নিমরাজি হলে নেমে আসছে বঞ্চনার খড়গ এবং ধর্ষিতা নারীর অপমানের জবাব চাইলে মিলছে ভর্ৎসনা। এমনই এক সমাজ থেকে উঠে এসেছে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র, যিনি সর্বস্ব পণ করেও সমাজকে পাল্টাতে পারেন নি, বরঞ্চ দুর্বৃত্তদের পাতা ফাঁদে আটকা পড়ে মানসিক রোগীতে পরিণত হয়ে বিপন্ন হয়েছে তাঁর জীবন। হতাশা, আশা – নিরাশার দোলা চলে আবর্তিত হয়ে মানবতার অপমানের জ্বালা মূর্ত হয়েছে নানা স্বরে গোটা উপন্যাস জুড়ে। এই উপন্যাস যেমন প্রতিবাদের, পরাজয়েরও বটে, বর্তমানের আরশিতে অতীতকে আমন্ত্রণের এক নতুন দিশা।”

আসলে যখন কোনো ব্যক্তি তার জীবনের চরমতম সংকটমুহূর্তের সামনে এসে পড়ে, বুঝতে পারে প্রকৃত পরিস্থিতি, তখন তাঁকে সেই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে নিজেকেই কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সে তার স্বকীয়তা – স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করে। উপলব্ধি করে বেঁচে থাকার অর্থ। মানুষ মাত্রেই বয়ে নিয়ে বেড়ায় নৈতিক, স্বাধীন, আবেগ। তার বেঁচে থাকাও তাই তুচ্ছ সাধারণ বিষয় নয়।

বিশ্বায়নের যুগে আজও ধর্মাচরণ আর বিশ্বাসের কারণে, ঈশ্বরের নামে, মানুষের হত্যাকাণ্ড ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে চলেছে পৃথিবীতে। আর এই অধিবিদ্যাকে চ্যালেঞ্জ জানানো মানুষকে পড়তে হয় নানাবিধ প্রতিকূলতার সামনে। জয়ের সাথে সাথে পরাজয়েরও মুখোমুখি হতে হয় তাকে। অধিবিদ্যার অসমগত প্রভাব যে ছড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের রুচি, ভাষা, আচার-ব্যবহারের মধ্যে। সময়ের মায়াবী খেলায় নিজেকে যোগ্য করে তুলতে না পারলে রক্ষা করার কিছু থাকে না আর। আজকের সমাজে যেখানে ভোগবাদ নামক অসুখে অধিকাংশ মানুষ আক্রান্ত, বিভ্রান্ত, সেখানে লেখক এমন এক চরিত্রকে আঁকতে চেয়েছেন যে অন্তত সমাজ বদলাবার কথা ভাবে। যার মধ্যে চেষ্টা মরে যায়নি। আজ হয়ত সে সফল হয়না তাঁর কাঙ্খিত লক্ষ্যে, কিন্তু তার প্রচেষ্টা পাঠকের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। বর্তমান সময়ের নাগরিক, আধা-নাগরিক, ও গ্রামীন পৌর সমাজের জটিল দহনকথা আরও স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া যায় শরদিন্দু সাহার ‘চরণ’ উপন্যাসে।

‘বিষয়ান্তরে প্রবহমানতার পাঁচালী’ আখ্যানের লেখক রবিন ঘোষ তাঁর এই রচনার ভূমিকা অংশে লিখেছেন, “রাতারাতি হতবুদ্ধিহীন ভাবে বামপন্থী সাজার নাটকটা খারাপ লাগে না। স্রেফ ষড়যন্ত্রী মনে করা না করা নিয়ে হাসি পায়। সাম্যবাদ বিরোধীরা সাম্যবাদী মঞ্চে, তখনই দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি কেমব্রিজ হাভার্ডকে পাশ কাটিয়ে স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার লক্ষ্যে অধ্যক্ষ পেটানো, যা ওঁছা-ঝটতি-পড়তিদের তাণ্ডবে শিক্ষায় বিপ্লব ঘটানো রক্তচ্ছ্বাসের আকুতিটুকু নিয়ে ‘কারু মুখে দ্বিরুক্তি নেই- পথ নেই বলে শতাব্দী শেষ হলে এরকম আবিষ্ট নিয়ম নেমে আসে’।” অর্থাৎ প্রথমেই লেখক তার রচনার সারবত্তা নিয়ে একটা আভাস পাঠককে দিতে চাইলেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। রবীন্দ্র –যুগ থেকেই ঘটনা পরম্পরার বিবরণের বদলে বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসার উন্মোচন বাংলা উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারা হিসেবে উঠে এসেছে। বহুস্বরিক জীবনব্যাখ্যা ও মীমাংসাহীন জীবনবোধ উল্লেখযোগ্যভাবে উঠে এসেছে বাংলা সাহিত্যে। আর রবিন ঘোষের এই সাম্প্রতিক উপন্যাস পাঠ করে আমাদের মনে হয়, তিনি সেই বিরল গোত্রের লেখক যার লেখা পড়তে গেলে ভাবতে হয়, তথাকথিত ঔপন্যাসিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত লেখার তাৎপর্য নিয়ে। ভাবতে বাধ্য হতে হয় পাঠের বাকসংহিতা, আখ্যানের আকল্প বা ডিজাইন নিয়ে। ভাবতে হয় প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের মধ্যে ক্ষমতার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতির কথা। ভাবতে হয় প্রকরণগত শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খল হিসেবে চিহ্নিত করার যৌক্তিকতা নিয়ে।

কোনও কোনও পাঠকের মনে হতেই পারে তত্ত্বচিন্তার প্রগাঢ় উপস্থিতিতে এই উপন্যাসটি পাঠ করার আনন্দ ব্যাহত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা উচিত উপন্যাসের অভ্যস্ত আকল্পটির সৃষ্টি হয়েছে প্রতীচ্যের কিছু নির্দিষ্ট ধারনার উপর ভিত্তি করে। কোনও পাঠে তত্ত্বের উপস্থিতির অর্থ তো, সুশৃঙ্খলিত অবস্থান। তাই তত্ত্বকে অস্বীকার করার অর্থ আসলে দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ভ্রমের সাথী হওয়া।

জয় ভদ্র এই সময়ের তরুণ কথাকার। ইতিমধ্যেই তার লেখা পাঠক মহলে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। এসময়ের অন্য অনেক তরুণ লেখকদের মতো জয়ের লেখাতেও ফুটে উঠে স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাবার অদম্য ইচ্ছা। নিজস্ব ভাষা, ভঙ্গি তৈরিতে প্রথম থেকেই সচেষ্ট তিনি। বিষয় ভাবনার ক্ষেত্রেও তিনি স্বকীয়। সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কথা গভীরভাবে ফুটে উঠে তাঁর লেখায়।

‘ইডিকেস’ জয় ভদ্রের সাম্প্রতিক গল্প সংকলন। প্রথমও বটে। গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে মোট ১১ টি গল্প । এগুলি হল, আগামীকাল, নীলাভ থুতু, উত্তরাধিকার, ৫৬তম স্বাধীনতা দিবস, এক অজানা জনপদের উপকথা, শহরে ঘটে যাওয়া কিছু অলৌকিক ঘটনা, হাম্বা, ইডিকেস, ভয়াল বিস্ফোরণের পরের ঘণ্টাগুলো, পরদিন শহরে কারফিউ ঘোষিত হয়েছিল, এবং ওহ।

এই গল্পগ্রন্থে লেখক এঁকেছেন অশান্ত, অস্বস্তিকর, হিংসায় পরিপূর্ণ সমাজের ছবি। “এই গল্পগুলি আসলে রাজনৈতিক রূপক। লেখকের কণ্ঠস্বর প্রতিবাদী, কিন্তু শিল্প সম্মত। সব সময়ই নানা অবিশ্বাস্য ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। লেখক পাঠককে স্বপ্ন ও বাস্তবের প্রান্তসীমায় নিয়ে গিয়ে চমকে দিতে চান। আর সেই জাদুবাস্তবতাময় চমকের ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে যেতে তিনি একটি অভিশপ্ত সময়ের মানচিত্র আঁকতে চান।”\* জাদুবাস্তবতাময় এই রচনায় প্রান্তজনের স্বপ্নের বুননকে অন্ধকারের ভিতর থেকে আলোয় আনতে চেয়েছেন লেখক। পাঠকের কাছে সর্বদা কাহিনীগুলি সুখস্মৃতি বয়ে না আনলেও, এনেছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। বিশেষত, ইডিকেস, হাম্বা, শহরে ঘটে যাওয়া কিছু অলৌকিক ঘটনা, ওহ, গল্পগুলিতে এই অনুভূতি পাঠকের স্বভাবতই হতে পারে। আজকের আধুনিক সময়ে বিশ্বাস – অবিশ্বাসের জলবিভাজনরেখা মুছে গেছে। আপাত-দৃষ্টিতে বিস্ময়হীনতার সংক্রমণ নির্বাধ হয়ে উঠলেও তাঁরা বাস্তবের অবতলে অজস্র অন্ধবিন্দু ও শূন্যস্থানগুলিকে খুঁজে নিচ্ছে । চেনা আদলের মধ্যেও ফাঁকফোকর খুঁজে চলে আসছে অচেনা আদল। জয় ভদ্রের এই গল্প সংকলনের কাহিনীগুলিও তার ব্যতিক্রমী নয়।

এই আলোচনার পরিশেষে আমরা স্মরণ করে নিতে পারি অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের উপন্যাস সংক্রান্ত ভাবনাকে। তিনি মনে করেন, “আখ্যানতত্ত্বের অভিনবত্ব এখন উপন্যাস – গ্রন্থনার চিরাগত ধারণাকে পশ্চাৎভূমিতে ঠেলে দিয়েছে। সমালোচকদের ভাববিশ্ব আন্দোলিত হচ্ছে নানা ধরণের চিন্তা সন্ত্রাসে। আসন্ন মুহূর্তের জিজ্ঞাসায় দ্রুত পেছনে সরে যাচ্ছে ভূতপূর্ব মুহূর্তের প্রশ্নাবলী। কোনো গল্প নেই জীবনে, নেই কোনো আরম্ভের, সমাধানের নিশ্চয়তা। এরই মধ্যে পথ-পাথেয়-গন্তব্য খুঁজে চলেছেন কথাকারেরা আর উপন্যাস ভাবুকেরা। তাঁদের মধ্যে কখনও মৈত্রী কখনও বা ব্যবধান। এমনকী, কখনও তাঁরা পরস্পরের কাছে যুযুধান প্রতিপক্ষ ।” #

\*এই সময় (দৈনিক সংবাদপত্র)/ তারিখ- ০৬-১০-২০১৩/ কলকাতা ।

# উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ/ পৃঃ- ১৩৬/ তপোধীর ভট্টাচার্য/ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ/ কল- ০৯।

গ্রন্থ পরিচয় -

১। আয়লা সময় অসময়/ উৎপলেন্দু মণ্ডল/ বইওয়ালা/ কলকাতা- ৫৯।

২। বাড়িঘর/ তৃষ্ণা বসাক/ একুশ শতক/ কলকাতা- ৭৩।

৩। মায়াউড়ান/ সুকান্তি দত্ত/ পাল পাবলিশার্স/ কলকাতা- ০৯।

৪। চরণ/ শরদিন্দু সাহা/ করুণা প্রকাশনী/ কলকাতা- ০৯।

৫। বিষয়ান্তরে প্রবহমানতার পাঁচালী/ রবিন ঘোষ/ বিজ্ঞাপনপর্ব/ কলকাতা- ০১।

৬। ইডিকেস/ জয় ভদ্র/ কথক/ কলকাতা- ৬৩।

ঘটি-বাঙাল সমস্যা ও সমরেশ মজুমদারের কয়েকটি উপন্যাস

সঞ্জীবন মণ্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

ঘটি-বাঙাল নিয়ে আলোচনা করার আগে আমাদের এই সমস্যার উদ্ভব,প্রেক্ষাপট,বিস্তার ও দ্বন্ধ জটিলতা সম্বন্ধে একটু জানা দরকার। অবিভক্ত বাংলার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ দুটি বিভাগ নিয়েই ভারতের শস্যশ্যামলা বঙ্গ ছিল। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার শাসনকার্যের সুবিধার্থে বঙ্গবিভাজনে উদ্যোগী হলে দুই বাংলারই আপামর জনসাধারণ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বাংলাকে অখণ্ড রাখতে তাঁরা সমর্থ হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপট এ দেখা যায় দুই বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি খাদ্যাভ্যাষে পার্থক্য থাকলেও বাঙ্গালি কিন্তু ঘটি-বাঙাল দ্বন্ধকে প্রশ্রয় না দিয়ে অখণ্ড বাংলার প্রতিই তাদের মায়া মমতা ও ভালোবাসাকে উজার করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাঙ্গালির ভাবাবেগকে অখণ্ড বাংলার প্রতি উদ্দীপ্ত করার জন্য লিখেছিলেন-‘বাংলার মাটি বাংলার জল/বাংলার বায়ু বাংলার ফল/পূণ্য হউক পূণ্য হউক পূণ্য হউক হে ভগবান’।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য-বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগ থেকেই আমরা ‘বাঙাল’ শব্দটির সাথে পরিচিতি লাভ করলেও ‘ঘটি’ শব্দটি কিন্তু মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায়না। তবে ‘ঘটি’ শব্দটি যে পশ্চিমবাংলার লোকেদের বোঝাত তার প্রমাণ আমরা পাই একটি প্রবাদে-‘তাল পুকুরে ঘটি ডুবে না’ অর্থাৎ শস্য শ্যামলা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পূর্ববঙ্গ যে পশ্চিমবঙ্গের থেকে এগিয়ে ছিল তারই ব্যঙ্গার্থ বহন করে উক্ত প্রবাদটি এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শুস্করুক্ষ জলবায়ুর কথাও আমরা প্রবাদটিতে পাই। ‘বাঙাল’ শব্দটির সঙ্গে আমরা চন্ডীমঙ্গল,চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি সাহিত্যে পরিচিতি লাভ করেছি। উক্ত সাহিত্যে ‘বাঙাল’ শব্দটি মুলত ব্যবহৃত হয়েছে ঠক,বোকা,চতুর,নিঃস্ব প্রভৃতি প্রতিশব্দ হিসেবে। আবার ‘ঘটি’ শব্দটির প্রচলন হয়েছে অনেক পরে এবং শব্দটি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তি সময়কালে। ‘ঘটি’ শব্দটির অর্থ জলপাত্র; এর প্রতিশব্দ লোটার সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। কথিত আছে পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা একসময় দূরদূরান্তে যাওয়ার সময় রাস্তায় জলকষ্টের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লাঠির মাথায় একটি জলভর্তি ঘটি ঝুলিয়ে নিতেন এবং এই ঘটি বা লোটার সাহায্যে রাস্তার পাশে থাকা জলাশয় থেকে জল তুলে প্রয়োজনীয় কাজ করতেন। তাই পশ্চিমবঙ্গের লোক পূর্ববঙ্গের লোকের কাছে ‘ঘটি’ হিসেবে পরিগণিত হতেন। এই মতবাদের যুক্তি হিসেবে আমরা বলতে পারি পূর্ববঙ্গ মূলত নদীমাতৃক এলাকা, তাই জল সহজলভ্য কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ শুষ্ক ও খরা প্রবণ এলাকা হওয়ায় জলের একটা অভাব ছিলই বা বর্তমানেও আছে। বিশেষ করে বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,মেদিনীপুর,বীরভূম প্রভৃতি জেলা গুলিতে আজও জলের সংকট বর্তমান। আবার পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপ্রান্ত অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের ভূমিপূত্ররা নিজেদের ক্ষত্রিয় বা রাজবংশী হিসেবে তুলে ধরলেও অধুনা উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী ঘটি ও বাঙালদের কাছে তাঁদের পরিচয় দেশীয় বা এতদ্বেশীয় হিসেবে। রংপুর থেকে যাঁরা পশিমবঙ্গে এসেছেন তাঁরাও কামরূপী উপভাষায় কথা বলেন। কিন্তু তাঁদেরও প্রাথমিক পরিচয় ক্ষত্রিয় বা রাজবংশী। অর্থাৎ অবিভিক্ত বাংলার কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষার জনগোষ্ঠীর জনগণ কিন্তু ঘটি-বাঙাল দ্বন্ধের মধ্যে আসেনি। এমনকি পূর্ববঙ্গের নিন্মবর্ণের লোকেরা উত্তরবঙ্গের ভূমি পূত্রদের কাছে ঢাকাইয়া,ভাটিয়া বা দক্ষিণদেশী হিসেবে পরিচিত। এক্ষেত্রেও কিন্তু ঘটি-বাঙ্গাল দ্বন্ধ আসেনি। ঘটি-বাঙাল দ্বন্ধ এসেছে মূলত বঙ্গালী উপভাষার সঙ্গে রাঢ়ী,ঝারখন্ডী,বরেন্দ্রী উপভাষাভাষী জনগোষ্ঠির। অপরদিকে যশোর ও খুলনার লোকেরা নিজেদের ঘটি বলেই পরিচয় দিয়ে থাকেন,কেননা এই দুটি অঞ্চলের সাথে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তি অঞ্চলের মানুষের মৌখিক ভাষা,রীতি নীতি খাদ্যাভাসের অনেকটাই মিল রয়েছে। কিন্তু যশোর-খুলনার সাথে আমরা বাঁকুড়া,পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষার মিল খুঁজে পাইনা,এমনকি কলকাতা নদীয়ার ভাষার সাথে রাঢ়বঙ্গের মৌখিক ভাষারও বিপুল পার্থক্য রয়েছে। শুধু তাই নয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই এলাকা,গোত্র,গোষ্ঠী,সম্প্রদায় ভেদে রীতি নীতি আচার অনুষ্ঠানেরও পার্থক্য দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই আমরা সামগ্রীক ভাবে বলতে পারি শুধুমাত্র এলাকা গত দিক দিয়ে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ ভেদে ঘটি-বাঙাল দ্বন্ধকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়,বরং দুই বাংলার জনগোষ্ঠীর সামগ্রিকতাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এককথায় বাংলা ভাষাভাষীরা সকলেই বাঙ্গালী সে তাদের মৌখিক উচ্চারণ যে বঙ্গউপভাষাই হোকনা কেন।

যাইহোক, ঘটি-বাঙাল সমস্যা প্রকট হতে থাকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কলকাতায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। তারপর ’৪৭ এর দেশভাগ ও ’৭১ এর সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা এই সমস্যাকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। কেননা এই সময়কালে পূর্ববঙ্গের মানুষ মাত্রই রাঢ়বঙ্গ,কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে বাঙাল অর্থাৎ নির্বোধ,চালাক,নতুবা ছোট মানসিকতার জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিগণিত হত,যেখানে সমগোত্র বা গোষ্ঠীকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে উত্তরবঙ্গের ভূমিপূত্রদের কাছে পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীরা ‘বাঙাল’ হিসেবে পরিগণিত হয়নি; রংপুর বাদে পূর্ববঙ্গের সমস্ত জনগোষ্ঠীই তাঁদের কাছে ঢাকাইয়া,ভাটিয়া বা দক্ষিণদেশী হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এবং প্রায় সমভাষী রংপুর জেলার লোকেরা কুচবিহার,জলপাইগুড়ি ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে ‘রংপুরিয়া’ হিসেবে পরিচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য- বঙ্গালী উপভাষাভাষী লোকেদের রাঢ়ী ঝাড়খন্ডী,বরেন্দ্রী ভাষাভাষী লোকেরা যেমন সহজে মেনে নিতে পারেনি,তেমনি উত্তরবঙ্গের কামরূপী ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীও কিন্তু রংপুরের অধিবাসীদের সহজেই মেনে নেননি;মৌখিক ভাষা,রীতি নীতি ও সংস্কৃতির মিল থাকলেও। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে আমরা দেখতে পাই পূর্ববঙ্গ যেহেতু কৃষিপ্রধান ও জলপ্রধান এলাকা তাই সেখানকার অধিবাসীরাও পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও জলপ্রধান এলাকা গুলিতেই নিজদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। অবশ্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবার গুলি উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তি অঞ্চল সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে অবস্থান করেছেন। কিন্তু আসাম,আন্দামান,মরিচঝাঁপি,দন্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু বাঙ্গালির বসবাসের ইতিহাস আলাদা ব্যাপার।

জন্ম সূত্রে সমরেশ মজুমদার নদীয়া জেলার খাঁটি ঘটি পরিবারের সন্তান হলেও পিতার কর্মসূত্রে জলপাইগুড়ি জেলার এমন একটি জায়গায় তাঁর শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছে যেখানে মূলত আদিবাসী ও রাজবংশী সম্প্রদায়েরই বসবাস। চা বাগানে কাজের জন্য ইংরেজরা হাজারিবাগ,রাঁচি,সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আদিবাসী,মদেশীয়া প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর লোকেদের নিয়ে এসেছিলেন ডুয়ার্সে। তাই আজও উক্ত অঞ্চল গুলির সাথে ডুয়ার্সের এই উপজাতি সম্প্রদায় গুলির দৈহিক,সামাজিক,সাংস্কৃতিক ও ভাষার মিল রয়েছে;থাকাটাও স্বাভাবিক। উত্তরবঙ্গ যেহেতু রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকা তাই ডুয়ার্সেও এঁরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। অর্থাৎ সমরেশবাবুর পূর্বপুরুষ ঘটি প্রধান্ এলাকার হলেও তিনি কিন্তু বড় হয়েছেন রাজবংশী,আদিবাসী ও মদেশীয়া অধ্যুষিত এলাকায়। সেদিক থেকে আমরা দেখতে পাই সমরেশ বাবুর জন্মের আগে থেকেই ডুয়ার্সের সংস্কৃতি মিশ্র সংস্কৃতির দিকে এগোচ্ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাঁর জন্ম। অর্থাৎ তাঁর শৈশবেই দেশভাগ হয়েছে এবং ’৭১ এ স্বাধীন বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠার সময় তিনি পূর্ণযুবক। তাই তিনি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের খুব কাছে থেকেই দেখেছেন। সমরেশবাবু জলপাইগুড়ি ও কলকাতায় জন্ম ও কর্ম সূত্রে আজও বর্তমান,তাই তাঁর লেখায় আমরা উত্তরবঙ্গ,কলকাতা ও তার সন্নিহিত পরিবেশকে যেমনভাবে পাই রাঢ়বঙ্গ অর্থাৎ বাঁকুড়া,পুরুলিয়া বীরভূমের কথা তেমনভাবে পাইনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সমগ্র উত্তরবঙ্গ,কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তি অঞ্চলে পূর্ববঙ্গের লোকেরা দেশান্তরী হয়ে বসতি গড়ে তুললেও রাঢ়বঙ্গে কিন্তু তাদের প্রভাব তেমন নেই। সমরেশ বাবুও তাই এই উদ্বাস্তু,শরণার্থীদের জন্ম থেকেই দেখে আসছেন বলেই তাঁর লেখনীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে এই চরিত্ররাও ভিড় করেছে।

‘কালবেলা’ উপন্যাসের নায়ক অনিমেষ মিত্র জলপাইগুড়ির ছেলে। তাই আমাদের মনে হতে পারে তিনি কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-? রাজবংশী,আদিবাসী,মদেশীয়া,বাঙাল না ঘটি? কেননা ‘কালবেলা’র যে সময়কাল-সেই সময়কালে জলপাইগুড়ি শহর ও গ্রাম গুলোতে রাজবংশীদের পাশাপাশি পূর্ববঙ্গের বাঙালরাও সংখ্যার দিক থেকে প্রায় সমান হয়ে উঠেছিলেন। অনিমেষ মিত্রের জন্ম স্বর্গছেঁড়া চা বাগানে;চা বাগান গুলোতে তো বিভিন্ন উপজাতিদেরই বসবাস ; কলকাতা ও রাঢ়বঙ্গের অধিবাসীরা তো চা বাগান গুলোতে সংখ্যায় খুবই কম। পদবী গত দিক থেকে বিচার করে অনিমেষবাবু কে আমরা ঘটি ও বাঙালের যে কোন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরতে পারি,কেননা মিত্র পদবী রাজবংশী ও উপজাতি সম্প্রদায় গুলির মধ্যে নেই। এই পদবীটি মূলত রয়েছে অবিভক্ত বাংলার কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে। ঔপন্যাসিক নিজে ঘটি কিন্তু বাঙাল ও রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকায় বেড়ে উঠে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে তিনি কোন পর্যায়ে ফেলেছেন? উপন্যাসটি পাঠ করে আমরা দেখতে পাই লেখকের নিজের জীবনের অনেকটাই ছায়া এই চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তাই অনিমেষ ঘটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হওয়াটাই স্বাভাবিক। পরবর্তি সময়ে অনিমেষকে আমরা পেয়েছিও তাই। ঘটি বাঙাল প্রভেদ করতে গিয়ে তিনি উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন-‘শ্যামবাজার থেকে বউ বাজারকে বলা হয় ঘটি এলাকা’ কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই ‘পূর্ববঙ্গের ধনবান শিক্ষিত মানুষেরা এসে দেশের উপরতলার চেয়ার গুলো দখল করে নিজেদের আলাদা গোত্র বলে চিহ্নিত করে নিলেন। …….কিন্তু স্বাধীনতার পর কলকাতা অন্য রকম চেহারা নিয়ে নিল………বেলঘরিয়া দমদম এলাকার সঙ্গে টালিগঞ্জ যাদবপুর গড়িয়ার মানুষদের চরিত্রগত মিল বেশী,কারণ এই সব এলাকার মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায় নিঃস্ব হয়ে এসে কলোনী স্থাপন করেছিলেন। দেশ ত্যাগের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা এঁদের জীবন যাত্রার ধরন পশ্চিমবঙ্গবাসীদের থেকে অনেক ধারালো করে দিয়েছে। অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং জেদী হওয়ায় ক্রমশ এঁরা কলকাতার উপর নিজেদের অধিকার কায়েম করে নিয়েছেন’।

‘কালবেলা’ উপন্যাসেই আমরা দেখি ছাত্রাবস্থায় অনিমেষ মিত্র অভাব অনটনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু পরমহংসের সাথে টিউশনি পড়ানোর বুদ্ধিপরামর্শ করলে পরমহংস তাঁকে ছাত্রী জোগার করে দিয়েছেন এবং এও জানিয়েছেন-‘একদম উত্তর কলকাতার খাঁটি ঘটিদের বাড়ি।………এইসব ঘটি মেয়ে গুলো এক একটা কাঁকড়া বিছে।’ পরমহংসের দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে পড়ানোর জন্য অনিমেষ শোভাবাজার চিৎপুর অঞ্চলের খাস ঘটি পাড়ায় গেলে ছাত্রীর পিতার সঙ্গে কথোপকথনে বাঙালদের প্রতি ঘটিদের বিদ্বেষকে সুনিপুণ ভাবে অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক। আমরা দেখি প্রথম দিনেই ছাত্রীর অভিভাবকের কাছে গৃহশিক্ষক অনিমেষবাবুকে নিজের পদবী,বংশ,গোত্র সমেত পূর্বপুরুষদের পরিচয় দিতে হয়েছে। পিতৃবাড়ি জলপাইগুড়ি শুনে ভদ্রলোক পরম বিস্ময়ে জানতে চেয়েছেন-‘জলপাইগুড়ি! ওখানে- মানে,তোমরা কি বাঙাল? না না বাঙাল মাষ্টার আমরা রাখবনা।’ পরমহংস পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রীক চিত্রকে তার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলে ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে প্রতুত্ত্যর দিয়েছেন-‘আমাকে শেখাতে এসো না তুমি। রাজশাহী,রংপুর,জলপাইগুড়ি সব এক গোত্রের।আমাদের পশ্চিমবঙ্গীয় চালচলনের সাথে কোন মিল নেই। ভাতের থালা খাটের উপর তুলে খায় সব’। আমরা জানি অনিমেষ মিত্রের পূর্বপুরুষ নদীয়া জেলা থেকে জলপাইগুড়ি গিয়েছিলেন চা বাগানের কর্মসুত্রে,অর্থাৎ অনিমেষবাবু বাঙাল পরিবারের সন্তান নন,খাঁটি ঘটি পরিবারের সন্তান শুনে বাড়ির মালিক তাঁকে গৃহ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করতে রাজি হয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা বলতে পারি যে দেশভাগের পরে ঘটি-বাঙাল সমস্যা কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তি অঞ্চলে একটা সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছিল। উভয় বঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপন ছিল অলীককল্পনা।এমনকি সামাজিক অনুষ্ঠান গুলিতেও তাঁরা একে অপরকে মেনে নিতে পারেননি। রান্না, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি, কথাবার্তা, প্রভৃতি বিষয়ে ফারাক আগে থেকেই ছিল। অবস্থাপন্ন এবং স্বল্পশিক্ষিত ঘটিরা মনে করতেন বাঙালরা কলকাতায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে; তাই বাঙালদের প্রায় জোড় করেই তাঁরা সামাজিক বয়কট করতেন। ঘটিদের এই গোঁড়ামির জন্যই তারা হয়তো দ্রুত পিছিয়ে পড়তে থাকেন বাঙালদের তুলনায়,যে কথা ঔপন্যাসিক স্বীকার করেছেন। তাই আমরা এই উপন্যাসেই দেখেছি অনিমেষবাবু নিজে ঘটি হয়েও উত্তর কলকাতার ঘটি পরিবারটির ছাত্রীকে পড়াতে পারেনি। কেননা প্রথম দিনই ভদ্রলোক অনিমেষকে বাইরের ঘরে অচ্ছুতের মত বসিয়ে জানতে চেয়েছেন-‘জলখাবার সহ পড়ালে পনেরো টাকা পাবে,বাদ দিলে কুড়ি’। অনিমেষ বাবুও প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাকেই সম্বল করে টিউশনিকে বিদায় জানিয়ে বলেছে-‘এরকম চশমখোর ব্যবসাদারের সঙ্গে আমার যে বনবে না তা বুঝতে পেরেছি’।

‘কালপুরুষ’ উপন্যাসের অধিকাংশ প্রধান চরিত্রই ‘কালবেলা’ উপন্যাসের চরিত্রদের মধ্য থেকেই উঠে এসেছে। এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র অর্ক; মাধবীলতা ও অনিমেষ মিত্রের এক মাত্র সন্তান।অর্ক উত্তরবঙ্গের কোন মফঃস্বলে জন্মগ্রহণ করেনি; অর্কর জন্ম হয়েছে কলকাতার বস্তি অঞ্চলে। বেলঘরিয়ার তিন নম্বর ইশ্বরপুকুর লেনেই সে জন্ম থেকে বড় হয়েছে। তাই তার বেশীরভাগ বন্ধুবান্ধবও বস্তি অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের এবং এই পরিবারগুলি ঘটি ও বাঙাল নির্বিশষে পাশাপাশিই অবস্থান করেছেন। ইশ্বরপুকুর লেন যেহেতু গরীরদের বস্তি তাই সেখানে কে ঘটি কে বাঙাল এই নিয়ে কারো মাথাব্যথা আমরা লক্ষ্য করতে পারিনা। এখানে উদ্বাস্ত নিয়ে সামান্য কথা বার্তা হলেও সকলেই ছুটছে নিজেদের পেটের তাগিদে। অর্থাৎ সেদিক থেকে আমরা বলতে পারি স্বচ্ছল পরিবার গুলোতে ঘটি বাঙাল ব্যাপক ভাবে প্রভাব বিস্তার করলেও নিঃস্ব দরিদ্র পরিবার গুলো কিন্তু কোন বাছবিচার করেনি। তাই অর্কর বন্ধু কোয়া নিজেকে উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান ভাবলেও ঘটি বাঙালের প্রভেদকে প্রশ্রয় দেয়নি। বিলু নামের সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকারও অর্কর কাছে নির্দ্ধিয়ায় জানায়-‘আমার সব বড়লোক আত্মীয় পাকিস্তানে,অ্যাদ্দিনে হয়তো তারা মিয়া সাহেব হয়ে গিয়েছে’। মাধবীলতা শ্বশুর মশায়ের অসুস্থতার খবর শুনে পূত্র ও অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে জলপাইগুড়ি যাওয়ার সময় শিলিগুড়ি পার হয়েই কথা প্রসঙ্গে ঠাট্টার সুরে বলেছেন-‘বাটিরা ভাল মানুষ হয় মনে হচ্ছে............নর্থবেঙ্গলের লোক বাঙাল আর ঘটি মিশিয়ে’। অর্থৎ উপন্যাসের কালসীমা অনুযায়ী ১৯৮৫ সালে ঘটি-বাঙাল প্রভেদ মুছে নতুন শ্রেণী বাটির উদ্ভব হয়েছে সমগ্র পশ্চিমবাংলা জুড়েই। শুধু তাই নয় ভিন্ন ভাষভাষী ও সম্প্রদায়ের মানুষেরাও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শুধুমাত্র নিজেদের গোঁড়ামিতেই আবদ্ধ থাকেনি; যুগের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও অভিব্যক্তি ঘটিয়েছে।

মহাকাব্যিক উপন্যাস ‘সাতকাহন’ দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের প্রেক্ষাপট ডুয়ার্সের স্বর্গছেঁড়া চা বাগান ও জলপাইগুড়ি শহর। তাই উপন্যাসে ঘটি-বাঙাল সমস্যা এসেছে। আমরা আগেও উল্লেখ করেছি সমরেশ মজুমদার জলপাইগুড়ি হতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন;তাঁর বিশিষ্ঠ উপন্যাস গুলিতেও উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতিকে ব্যাপক ভাবে তুলে ধরেছেন এবং উপন্যাস গুলিতে কোননা কোন ভাবে লেখকের নিজের জীবনের ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে। তাই ‘সাতকাহন’ উপন্যাসে আমরা দেখি অমরনাথ ‘ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে মামার এক বন্ধুর কাঠের ব্যবসায় চাকরি নিয়ে গেদে থেকে তিনি এসেছিলেন উত্তর বাংলায়’। চা বাগানে চাকরী সূত্রে তিনি ভিন্নভাষাভাষী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মেলা মেশা করলেও নিজের জাত্যাভিমানকে ভুলে থাকতে পারেননি। তাই মিশ্র সংস্কৃতিতে দীর্ঘ দিন থেকেও তিনি বান মাছ দেখেই চোখ ঘুরিয়ে নেন এবং-‘কবে বান মাছ খেয়েছেন মনে করতে পারলেন না অমরনাথ’। অমরনাথবাবুকে খুব নিখুঁত ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে ব্যক্তি সমরেশ বাবুর কোন নিকট অভিভাবককে আমরা তাঁর মধ্যে খুঁজে পাব। যাইহোক উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দীপার মধ্যে আমরা ঘটি বাঙালের কোন প্রভেদ পাইনা,কেননা দীপা যে সময়ের প্রতিনিধি সেই সময় উত্তরবঙ্গে শুধুমাত্র রাজবংশীদের একচ্ছত্র আধিপত্য কেড়ে নিয়েছে অন্যান্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা। তাই ছোট্ট দীপা বা দীপাবলী তাঁর বন্ধুদের জাতপাত বাছবিচার না করে সকলকেই আপন করে নিয়েছে,কিন্তু বাড়িতে ঠাকুরমা মা বাবা প্রভৃতি অভিভাবকগণের মধ্যে বাঙালদের প্রতি হেয় মনোভাব রয়েছে তা সে বুঝতে পারত। তাই বিশু-খোকনের সাথে মাছ ধরা কেন্দ্রীক আলোচনায় দীপা জানিয়েছে ‘বান মাছ মা রাঁধবে না’। কিন্তু বিশু উত্তর দিয়েছে-‘আমার মা রাঁধবে। তোরা ঘটি তাই ভাল জিনিস খাসনা’। ছোট্ট দীপা বিশুর কথা কিন্তু সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেনি-তাই তার মনে হয়েছে ‘আবার ঘটি বলে ঠোকা হল। ঠাকুমা বলে বাঙালদের কোনও বাছবিচার নেই’। অর্থাৎ ঘটি বাঙাল সমস্যা বাইরে অনেকটা স্বাভাবিক হলেও অভ্যন্তরে কিন্তু ছিলই।

এই উপন্যাসে সত্যসাধন মাষ্টার মশাই চরিত্রটি কিন্তু সর্বক্ষণ বঙ্গালী উপভাষাতেই কথা বলেছেন। দীপার বাল্যবিবাহও সুসম্পন্ন হয়েছিল ঘটি আচার রীতিনীতি মেনেই। সেদিক থেকেও আমরা বলতে পারি দীপার শ্বশুর বাড়ির লোকজনও ছিল ঘটি সম্প্রদায়েরই এবং সমরেশ বাবু সুপরিকল্পিত ভাবেই দুটি ঘটি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপন করেছিলেন,কারণ তৎকালীন সময়ে সামাজিক ভাবে ঘটি পরিবারের কন্যার সাথে বাঙাল পরিবারের পূত্রের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ অসম্ভব ব্যাপার ছিল । কিন্তু বাসর রাত্রের পরের দিনই দীপা বিধবা হলে তার শ্বশুর প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় দীপাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে নিজের ছোট মানসিকতাকেই তুলে ধরেছেন। অপর দিকে পূর্ববঙ্গের সর্বশান্তদের প্রতিনিধি হয়েও সত্য সাধনবাবু দীপার বিয়ের আগেই আক্ষেপ করেছিলেন-‘অন্যায়,ঘোরতর অন্যায়। সেই কবে বিদ্যাসাগর আন্দোলন করেছিলেন বাল্যবিবাহ বন্ধ হয় যাতে তার লাইগ্যা। কী লাভ হইল। আপনার মত শিক্ষিত মানুষ যদি না বোঝেন,ঘোরতর অন্যায়’। ঘটি পরিবারের কঠোর শাসনে বাল্যবিধবা দীপাকেও কিন্তু কঠোর অনুশানের মধ্যেই চলতে হয়েছে। তাই নিজের অনিচ্ছা সত্বেও ঠাকুরমার অনুশাসনে তাকে দীর্ঘ দিন নিরামীষ খেতে হয়েছে।

‘সাতকাহন’ উপন্যাসে সমরেশবাবু বলেছেন-‘যেহেতু পূর্ববাংলার জেলা ভিত্তিক ভাষার চেহারা আলাদা,চট্টগ্রামের মানুষের সঙ্গে যশোরের মানুষ একই গলায় কথা বলতে পারে না,তাই এখানে এসে একটি সংকর ভাষা তৈরী হল। ডুয়ার্সে যে সব মানুষ এসেছিলেন তাঁদের বাড়ি ছিল রংপুর রাজশাহী ইত্যাদি জেলায়। ঢাকার কিছু মানুষও দিগভ্রান্ত হয়ে এদিকে চলে এসেছিলেন।.........তাঁদের পরিবারের মহিলারাও পূর্ববঙ্গ থেকে বয়ে আনা সংস্কার এবং ধর্মান্ধতা আঁকড়ে ছিলেন। মেয়েদের বিয়ের আগে বা পরে চা বাগানের রাস্তায়,বা গঞ্জের পথে দেখা যেতনা। অন্তত যৌবন এলে তো নয়ই’। ডুয়ার্সের স্বর্গছেঁড়া চা বাগানের প্রবীণ নাগরিক,ঘটি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হয়েও তেজেন্দ্রবাবু সারাজীবন নীচ মানসিকাতার পরিচয়ই বহন করে গেছেন। বৃদ্ধ বয়সেও বাল্য বিধবা দীপার প্রতি তাঁর কামমনোভাবকে আমরা যেমন লক্ষ্য করতে পারি তেমনি তাঁর বাঙাল বিদ্বেষ কথা বার্তা সাম্প্রদায়ীকতাকেই উস্কে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট-‘বাঙালরা এসেই তো দেশের সর্বনাশ করেছে’। তাই তিনি মাইকেল মধূসুদন দত্তের গ্রামের নাম শুনেই বিদ্বেষে বলে উঠেছেন-‘সারাজীবন নকল ইংরেজ সেজে একটার পর একটা মেম বিয়ে করে যাওয়া খুব কৃতিত্বের কথা ? চার লাইন কবিতা লিখলেই কবি হওয়া যায় ?......কবি হলেন কুমুদ রঞ্জন মল্লিক......বর্ধমানের মানুষ’। আমরা জানি কবি সাহিত্যিকদের কোন জাত হয়না,তাঁরা সর্ব জাতের প্রতিনিধি,সমাজের সব কিছুকে তুলে ধরে,সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁদের কাজ। কিন্তু তেজেন্দ্রবাবুর মতো ব্যক্তির কাছে, নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির হয়ে শুধুমাত্র নিজের জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে মধূসুদন দত্তের মত কবির কবিত্বকে অস্বীকার করা মানে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিতকেই অস্বীকার করা। এখান থেকেই বোঝা যায় একটা সময় ঘটি-বাঙাল বিদ্বেষ সমাজের কতটা গভীরে প্রবেশ করেছিল।

এই উপন্যাসে আমরা রমলা সেন নামক আধুনিক মনস্কা একজন অধ্যাপিকাকে পাই যিনি ঘটি-বাঙাল দ্বন্ধের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সময়োপযোগী জীবন যাত্রায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে অধ্যাপিকা সুলভ মনোভাবকে তুলে ধরেছেন। অমরনাথবাবু ও তার পরিবারের সাথে আকস্মিক ভাবে পরিচিত হয়েই দীপাবলীকে জীবনে সাবলম্বী হওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তাই দীপাবলী বাল্য বিধবা হলেও; বলা যেতে পারে নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়,সত্যসাধন মাষ্টারের সহযোগীতায় এবং রমলা সেনের অনুপ্রেরণাতেই সে কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক পাশ করে জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজে ভর্তি হয়েছে; সেযুগের আবহে যা কল্পনাতীত। রমলা সেন নিজেকে ব্রাম্মধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরে যুক্তিগ্রাহ্য মনোভাব নিয়ে দীপাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তাই আমরা দেখি দীপাবলী শিলিগুড়িতে রমলা সেনের বাড়ি ঘুরতে গেলে তাদের মধ্যে ঘটি-বাঙালের বিদ্বেষ নিয়ে কোন কথা হয়নি;বরং এলাকাগত ভাবে মানুষের বৈচিত্র্যতাকেই তাঁরা সমর্থন করেছেন। কিন্তু রমলা সেনের অধ্যাপক বন্ধুর মধ্যে ঘটি-বাঙাল বিদ্বেষ ব্যাপার আমরা সহজেই লক্ষ্য করতে পারি। তিন জন একত্রে খেতে বসে তাঁদের মধ্যে যে কথোপকথন হয়ে ছিল সেখানে পাঠকবর্গ দেখতে পান খাবার সময় দীপা তরকারি সম্বন্ধে জানতে চাইলে রমলা সেন জানিয়েছেন-‘পোস্ত ঝিঙে চিংড়ি দিয়ে। তোমরা পোস্ত খাওনা’। ‘বাড়িতে হয়না’-দীপাবলীর উত্তর শুনে রমলা সেনের বন্ধু বর্ধমান নিবাসী সুধাময়বাবু অবাক হয়ে বলেছেন-‘এই রকম ডিলিশিয়াশ তরকারি তোমরা খাওনা’। রমলা সেন কিন্তু অবাক হননি-তিনি বাস্তব কথাই শুনিয়েছেন অধ্যাপক বন্ধুকে-‘পোস্তটা দক্ষিণ বাংলায় চালু বেশী। উত্তর বাংলায় এখনও চালু হয়নি’। কিন্তু সুধাময়বাবু উত্তর দিয়েছেন-‘অদ্ভুত তো’। এই কথার যুক্তি হিসেবে রমলা সেন জানিয়েছেন-‘অঞ্চল ভিত্তিক খাবার খাওয়ার অভ্যেস তো হবেই। পূর্ব বাংলায় শুটকির চল খুব বেশী কিন্তু দক্ষিণ বাংলায় লোকে বমি করবে’। এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি রমলা সেন জীবনে প্রায় সমগ্র বাংলা পরিভ্রমন করে বাংলার বৈচিত্র্য ও প্রকৃতিকে দুচোখ ভরে উপভোগ করেছেন এবং নিজেকে মানিয়েও নিয়েছেন-তাই তাঁর মধ্যে কোন ধর্ম বিদ্বেষী,জাতি ও সম্প্রদায় বিদ্বেষীতা প্রাধান্য পায়নি। কিন্তু সুধাময়বাবু,তেজেন্দ্রবাবুরা জীবনে নিজেদের গন্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছেন; তাই গন্ডীর বাইরের সংস্কৃতিকে কখনোই মেনে নিতে পারেননি।

দেশভাগ ও স্বাধীনতার এত বছর পরে শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে জাতি বিদ্বেষ অনেকটা মুছে গেলেও তার প্রভাব কিন্তু এখনো কমবেশী বর্তমান। তাই উপন্যাসিক ‘পরাণের পদ্মবনে’ নামক তাঁর স্মৃতি কথায় শুনিয়েছেন হিন্দু ও মুসলিম যে যে ধর্মাবলম্বীই হোকনা কেন বাংলা যদি তাদের মাতৃ ভাষা হয় তবে সে অবশ্যই বাঙ্গালি। কিন্তু অনেক হিন্দু বাঙ্গালিরা শুধু নিজেদেরই বাঙ্গালি ভাবেন;মুসলিমদের নয়। তাই তিনি উক্ত গ্রন্থে মা ও মেয়ের যে বাস্তবিক কথোপকথন উল্লেখ করেছেন তা তুলে ধরা যেতে পারে-

‘আচ্ছা মা বাংলাদেশে যারা থাকে তারা কারা?

মা বললেন-‘মুসলমান’।

‘ও। আমরা বাঙালি আর ওরা মুসলমান,না?’

‘মা মাথা নাড়লেন ‘হ্যাঁ বোঝাতে’।

সমরেশবাবু লক্ষ্য করেছেন মা ছোট্ট মেয়ের ভুল শুধরে না দিয়ে; মেয়ের কথাতেই সায় দিয়েছেন। স্বভাবত কারণেই মুসলমান সম্প্রদায়কে সেই মেয়েটি কখনই বাঙ্গালি ভাবতে পারবে না। যেমনটি হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ,দেশভাগ ও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দেশান্তরী হবার পর। ওপার বাংলার হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে এপার বাংলায় আসার পর থেকেই ঘটি বাঙাল ব্যাপারটি মাথা চাড়া দিয়ে এক বঙ্গের প্রতি অপর বঙ্গের মানুষ বিদ্বেষ রূপ ধারন করেছিলেন। ছোটরা পরিবারের বড়দের কাছেই এই বিদ্বেষের প্রাথমিক পাঠ আয়ত্ত্ব করে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায় কে হেয় করার চেষ্টা করেছে। এলাকা,পরিবেশ,জলবায়ূ ভেদে মানুষের কন্ঠস্বর যেমন পরিবর্তন হয়,তেমনি তাদের খাদ্যাভ্যাস,সংস্কৃতি রীতি-নীতির পার্থক্যও স্বাভাবিক। তাই বলে এই পার্থক্যকে কখনই উপহাস করা উচিত নয়। ঈষ্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের একটা প্রতিযোগী মনোভাব কাজ করলেও উভয় বঙ্গের বাঙ্গালিরাই কিন্তু উভয় বঙ্গে কর্ম,আত্মীয়তা প্রভৃতি সূত্রে যাতায়াত ছিল,তখন ঘটি-বাঙাল প্রাধান্য ছিলনা বলেই আমরা জানি। মূলত ঘটি-বাঙাল প্রাধান্য পেয়েছে দেশ ভাগের ফলেই। স্বাধীনতার এত বছর পরে দুই বঙ্গের বাঙ্গালিদের মধ্যে মেলামেশা,আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপন অনেকটা সহজ ব্যাপার হলেও রক্ষণশীল,স্বল্পশিক্ষিত বা নিজ গন্ডী ও ধ্যান ধারণায় আবদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের বাঙ্গালির মন থেকেই কিন্তু ঘটি-বাঙাল দ্বন্ধ মুছে যায়নি।

যাইহোক,সমরেশ মজুমদার তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রদের কিন্তু উদ্বাস্তু সমাজ থেকে তুলে ধরেননি,উত্তরবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের সাথে কলকাতাকে তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু তরাই ও ডুয়ার্স মূলত রাজবংশী,আদিবাসী,নেপালী,পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেশান্তরীদেরই বসবাস। উক্ত অঞ্চল থেকে তাঁর অধিকাংশ চরিত্র গড়ে উঠলেও প্রধান চরিত্র বা বিশিষ্ট চরিত্রদের কিন্তু উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী সম্প্রদায় গুলি হতে নেননি,নিয়েছেন কলকাতা,নদিয়া,বর্ধমানের সম্ভ্রান্ত তথাকথিত ঘটি পরিবার গুলি হতে। এ ক্ষেত্রে আমরা বলতেই পারি তিনি যদি তাঁর চরিত্র নির্মানে অঞ্চলের বৈষম্য না ঘটিয়ে সকল সম্প্রদায়কেই প্রাধান্য দিতেন তবে উপন্যাস গুলি আরও বাস্তপোযোগী ও সময়োপযোগী হত। যেমনটি হয়েছে প্রফুল্ল রায়ের মহাকাব্যিক উপন্যাস ‘কেয়াপাতার নৌকো’-যেখানে তিনি মূল চরিত্রকে বাঁকুড়া জেলার ঘটি পরিবার থেকেই পূর্ববঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাকমূহুর্তে। এবং সেই পরিবারটিকেই কেন্দ্র করে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে দেশ ভাগ কেন্দ্রীক অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। অপরদিকে ‘অর্ধেক জীবন’ এর স্রষ্টা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অকপটে স্বীকার করেছেন ‘দেশ স্বাধীন হল,আমরা দেশ হারালাম’। তিনি বাঙাল পরিবারের সন্তান হয়েও বিয়ে করেছিলেন কলকাতার খাস ঘটি পরিবারে। এক্ষেত্রে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর দাম্পত্য জীবন কিন্তু সুখেরই ছিল;বাঙাল কবির ঘটি স্ত্রী কিন্তু সবকিছুর মধ্যে বৈষম্য না খুঁজে সামঞ্জস্যকেই খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। সুনীলবাবু আরও জানিয়েছেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঘটি পরিবারের প্রতিনিধি হওয়ায় বাড়িতে বোয়াল মাছ খাওয়ার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি কিন্তু সুনীলবাবুর বাড়িতে তিনি নির্দ্ধিয়ায় বোয়াল মাছ এবং বাঙাল রান্না খেয়ে প্রশংসাই করেছেন। আমরা আরও বলতে পারি অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন বাঙাল হলেও ঘটি সমাজ কিন্তু তাঁকে বিদ্রুপ করেনি এমনকি বিখ্যাত ফুটবলার চুনী গোস্বামী বাঙাল হয়েও মোহনবাগান ক্লাব থেকেই তিনি সর্বভারতীয় হয়েছেন। তাই ইস্টবেঙ্গল মোহন বাগান ক্লাবকেও বাঙাল ও ঘটিদের ফুটবল ক্লাব বলে বিভেদ করার কোন মানে নেই। কেননা শিল্প,সাহিত্য,চারুকলা,ভাস্কর্য প্রভৃতি যুগ যুগ ধরে কোন জাতি,সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী বা ঘটনার কথাকেই তুলে ধরে বা তার ঐতিহ্য বহন করে থাকে। দেশভাগের পূর্বে দুই বঙ্গই ভারতের সমৃদ্ধশালী এলাকা ছিল কিন্তু রাজনৈতিক ও দ্বিজাতি তত্ত্বের কারণে বঙ্গভঙ্গ হলেও উভয় বঙ্গের মূল অধিবাসীদের একে অপরের প্রতি বিদ্বেষের দিকে ঠেলে দেওয়া মূর্খামী ছাড়া আর কিছুই নয়,কেননা বাংলা ও বাঙ্গালিকে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠা করেছে উভয় বঙ্গের বাঙ্গালিরাই।

রতন বিশ্বাস সম্পাদিত ‘উত্তরবঙ্গের ভাষা’ গ্রন্থে প্রাবন্ধিক বিমলেন্দু মজুমদার তাঁর প্রবন্ধে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত ২৫১টি ভাষা ও উপভাষার উল্লেখ করেছেন। ভাষাগত ও অবস্থানগত দিক থেকে তিনি দুইবঙ্গের অধিবাসীদের ঘটি-বাঙাল প্রভেদ না করে মিশ্র বাঙ্গালী চিত্রকেই তুলে ধরেছেন। বিমলেন্দুবাবু তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন-‘দেশ বিভাগের পরবর্তি কালে বিভিন্ন পর্বে যে সব বাস্তুহারা এ জেলায় এসেছেন এবং আসাম থেকে উৎখাত হয়ে যে সব বাঙালি বাস্তুহারা আশ্রয় গ্রহণ করেছেন,এঁদের অধিকাংশই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। এঁরা নেপালীদের মতোই পরিশ্রমী এবং কর্মকুশল। ফলে গত ৩-৪ দশকের মধ্যে কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য সরকারি অনুদান ছাড়াই নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার লক্ষণীয় উন্নতি ঘটিয়েছেন। এঁদের কর্মতৎপরতা জেলার অন্যান্ন অধিবাসীদেরও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিতে উৎসাহিত করেছে।............এঁরা ছাড়া জেলার চা বাগান গুলির জন্মলগ্ন থেকে সেই সূদুর প্রাচীনকালে একদল বাঙালি এসে চা বাগানে উপস্থিত হয়েছিলেন। চাবাগানের এই কর্মচারীরা সাহেব এবং চা শ্রমিকদের কাছে ‘বাবু’ নামে পরিচিত। এঁরা এসেছিলেন অবিক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে। এঁরা যে ভাষায় এক একটা চা বাগানে কথা বলতেন তাকে বলা যেতে পারে ‘বাবু বাংলা’। অর্থাৎ যাঁদেরকে আমরা ঘটি বলে জানি বিমলেন্দুবাবু তাঁদেরই বাবু বাঙ্গালি বলে উল্লেখ করেছেন। বিমলেন্দুবাবুর প্রবন্ধানুসারে জলপাইগুড়িতে আসাম ও পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের আগমনের অনেক আগে থেকেই কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষা ব্যবহারকারী বাঙ্গালি এবং বাবু বাঙ্গালিরা সহবস্থান করে আসছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাবু বাঙ্গালিদের সাথে উররবঙ্গের ভূমি পূত্রদের আত্মীয়তা সম্পর্কের কথা আমরা পাইনা। খুব অচিরেই বাবু বাঙ্গালিদের সাথে আত্মীয়তা স্থাপন হয়েছিল বঙ্গালী উপভাষা ব্যবহারকারীদের অর্থাৎ বাঙালদের। তাই ঘটি বাঙাল মিলে এক নতুন শ্রেণী বাটি বাঙ্গালির সাথে আমরা পরিচিত হই, যে কথা সমরেশবাবুও উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ বা অধুনা বাংলাদেশের সিমান্তবর্তী জেলা গুলোর ভাষা,সংস্কৃতি,খাদ্যাভাসের মিল থাকায় দুই বঙ্গের সীমান্তবর্তী বাঙ্গালীদের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপন হয়েছে ঘটি বাঙাল তিক্ততাকে দূরে সরিয়ে। যেমনটি হয়েছে রংপুরের বাস্তু হারাদের সাথে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের। কিন্তু পশিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চল, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বাদে অন্যান্য জেলা যেমন বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল গুলোর সাথে পূর্ববঙ্গের বাস্তু হারাদের আত্মিয়তা গড়ে উঠেনি বলেই চলে। কেননা এই অঞ্চল গুলোতে উদ্বাস্তুদের বসবাসও খুব কম এবং রীতি নীতিরও বিস্তর ফারাক,তাই কেউই কেউকে মেনে নেয়নি বা নিতে পারেনি। আবার উত্তরবঙ্গ জুড়ে বাঙ্গাল,রাজবংশীরা সহবস্থান করলেও উভয়ের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে আত্মীয়তা স্থাপন হয়নি;যেমনটি হয়নি বাবু বাঙ্গালিদের সাথে রাজবংশীদের। তাই ঘটি বাঙাল মিলে বাটি শ্রেণীর উদ্ভব হলেও রাজবংশী বাঙ্গাল বা রাজবংশী ঘটি মিলে নতুন কোন শ্রেণীর কথাও সমরেশ মজুমদার তাঁর উপন্যাস গুলিতে কোথাও উল্লেখ করতে পারেননি।

সহায়ক গ্রন্থ ও তথ্যপঞ্জী

১। সমরেশ মজুমদার,কালবেলা,আনন্দ পাবলিশার্স,সপ্তবিংশ মুদ্রণ ১৪১৭,কলকাতা ২। সমরেশ মজুমদার, কালপুরুষ, আনন্দ পাবলিশার্স, উনবিংশ মুদ্রণ২০১১, কলকাতা

৩।সমরেশ মজুমদার,সাতকাহন,আনন্দ পাবলিশার্স,প্রথম অখন্ড সংস্করণ ২০০৯,কলকাতা

৪। সমরেশ মজুমদার,পরানের পদ্মবনে,সাহিত্যম,প্রথম প্রকাশ কলকাতা বই মেলা ২০১২,কলকাতা

৫। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য,রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা,ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী,দশম সংস্করণ ১৪১৬,কলকাতা

৬। সুকুমার সেন,বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-চতুর্থ খন্ড,আনন্দ পাবলিশার্স,পঞ্চম মূদ্রণ ২০০৭,কলকাতা

৭। সুকুমার সেন,ভাষার ইতিবৃত্ত,আনন্দ পাবলিশার্স,নবম মুদ্রণ ২০০২,কলকাতা

৮। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,মডার্ন বুক এজেন্সী,দশম পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৯০,কলকাতা

৯। রতন বিশ্বাস (সম্পাদিত), উত্তরবঙ্গের ভাষা,বইওয়ালা,প্রথম প্রকাশ ২০০৪,কলকাতা

১০। অধ্যাপক মিহির চৌধুরী কামিল্যা,ভাষাতত্ত্ব-বাংলা ভাষার ইতিহাস,মন্ডল বুক হাউস,চতুর্ত সংস্করণ,কলকাতা

১১। শৈলেন বিশ্বাস(সঙ্কলিত)সংসদ বাঙ্গালা অভিধান,সাহিত্য সংসদ,অষ্টাদশ মুদ্রণ ১৯৯৫, কলকাতা

১২। প্রফুল্ল রায়,কেয়াপাতার নৌকো,করুণা প্রকাশনী,অষ্টম অখণ্ড সংসকরণ ২০১২,কলকাতা

১৩। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,অর্ধেক জীবন, আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রন ২০১০, কলকাতা

\*\*\*

ক) অভিজিত সাধুখাঁ,অভিজিত ব্যানার্জী- ঘটি-বাঙালের সামাজিক চিহ্নক : ইতিহাস, প্রেক্ষিত, প্রাসঙ্গিকতা(প্রবন্ধ), দেশভাগের সাহিত্য : স্মৃতি ও সত্তার উত্তরাধিকার, আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা